আঠারো শতকের
বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ

ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায়

সা হি ত্য. লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট। ক ল কা তা ৬

Atharo Sataker
Bangla Punthite Itihas Prasanga
by Dr. Anima Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯৪, অগস্ট ১৯৮৭

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : কৌশিক মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব, আজীবন শিক্ষাব্রতী
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে—

ভূমিকা

ডক্টর অণিমা মুখোপাধ্যায় এই বইতে আঠারো শতকের বাংলাদেশের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ রচনা করেছেন। এইসব ঘটনার উল্লেখ আমরা প্রচলিত ইতিহাসে পাই না তা নয়, কিন্তু সেগুলি উল্লেখমাত্র। লোকসমাজে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কোনো বিববণ আমাদের প্রচলিত ইতিহাস দেয় না।

তার প্রধান কারণ আমাদের প্রচলিত ইতিহাস মূলত এবং প্রধানত রাষ্ট্রপরিবর্তনের ইতিহাস। কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা এলেন তার বিবরণ রচনাই আমাদের প্রচলিত ইতিহাসের কাজ। ওই রাজকীয় উত্থান-পতনের সঙ্গে একটি বিপুল লোকজীবনের আলোড়ন জড়িত, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, সুখদুঃখবেদনা ও আশাভঙ্গের কোনো ইতিহাস আমরা সেভাবে বর্ণিত হতে দেখি না। রাষ্ট্রের পরিবর্তন হলে সমাজে অবশ্যই তার প্রতিফলন ঘটে। রাজা যদি বিদেশী হন, তবে দেশীয়দের প্রতি তাঁর কোনো হৃদয়গত দায়িত্ববন্ধন থাকবে না। স্বার্থসাধন সেখানে বড় হয়ে উঠবে এবং প্রজারা তার ফলভোগ করবে। রাজশাসন যদি দুর্বল হয় তবে প্রজাদের দৈনন্দিন জীবন তাতে বিঘ্নিত হবে। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের রাজনৈতিক ইতিহাসকে মুখ্যত অবলম্বন করলে প্রজার ইতিহাসে জোর কমে যায় এবং অনেক সময় বাস্তবচিত্র অনুদ্‌ঘাটিত থাকে। সাম্প্রতিক কালে নীচের তলার থেকে আহৃত তথ্যের উপরেই একশ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস গড়তে চান।

এই প্রবণতাটি প্রতিফলিত হয়েছে অণিমা মুখোপাধ্যায়ের এই বইটিতে। প্রচলিত ইতিহাসের বই খুললে দেখব আঠারো শতকে মোগল শাসনের ভাঙনের যুগে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ এবং সিরাজউদ্দৌল্লার রাজত্ব। নানারকম কূট ষড়যন্ত্র দুরভিসন্ধি কুটিল

প্রতিহিংসা রাজনৈতিক দাবাখেলার ভিতর দিয়ে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তার, দেওয়ানিলাভ, দুর্বল নবাবের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রজা-শোষণ। লর্ড ক্লাইভ থেকে লর্ড কর্নওয়ালিস পর্যন্ত ইংরেজ গভর্নরদের প্রশাসনের বিবরণ আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাস। এর সঙ্গে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা সন্ন্যাসী-ফকিরদের কথাও থাকে কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে এসব ঘটনার ভয়াবহতা তাদের শোক বিষাদ মৃত্যু ও অনিশ্চিত উদ্বেগের সামাজিক তথ্য বা চিত্র অনেকটাই নেপথ্যে থেকে যায়।

এর একটা কারণ এই যে, এই ইতিহাস রচিত হয়েছে সরকারি নথিপত্রের সাহায্যে, কোম্পানির ডেসপ্যাচের সহায়তায় অথবা সেকালের রাজপুরুষদের স্মৃতিকথার সাহায্যে। এইসমস্ত নথি রেকর্ড ডকুমেণ্ট ইতিহাস-লেখার পক্ষে মহামূল্যবান কিন্তু সে-সবই শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। লোকজীবনের ইতিহাস কোম্পানির ডেসপ্যাচে থাকবে না, তাদের খোঁজ করতে হবে সাধারণ মানুষের লেখায়, তাদের সাহিত্যে অথবা ছড়ায়। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রাপ্ত তথ্যকেও নতুন আলোতে আলোকিত করতে পারে। তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রায়সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ সরকারি উপ-করণের সাহায্যে লিখেছিলেন *The Sunnyasi Fakir Raiders of Bengal* (1930)। সম্ভবত এ-বিষয়ে এই বইটিই ছিল প্রথম। ঐতি-হাসিক যদুনাথ সরকার এই বইয়ের উল্লেখ করেছিলেন আনন্দমঠের বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকায়। সন্ন্যাসী-ফকিরদের তাঁরা ডাকাত লুঠেরা বলেই মনে করেছেন, যেমন সেকালে হেস্টিংস বা গ্লেইগ মনে করেছিলেন। কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিক এদের দেখছেন কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের প্রয়াস হিসেবে। তাদের আদর্শ ছিল না, শিক্ষা ছিল না কিন্তু ছিল কোম্পানি শাসনের প্রথম যুগে দেশের বিশৃঙ্খলায় অধীর মানুষের শৃঙ্খলাহীন বিদ্রোহ। বঙ্কিম আনন্দমঠে এই সূত্রটি দিয়ে সন্তানদের আদর্শবাদী কল্পনা করেছেন।

দেবী চৌধুরানীর সবটাই কি কল্পনা? সেকালের ছড়ায় কিসের ইঙ্গিত পাই?

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কিন্তু এইসব সামাজিক বিপর্যয়ের উল্লেখ তেমন পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র বর্গীর হাঙ্গামার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। আলিবর্দীর সময়ে বর্গীর আক্রমণ বছরে বছরে হ'ত। কবি ভারতচন্দ্র তখন অন্নদামঙ্গল লিখছেন। তিনি নিজে বর্গীর হাঙ্গামার পরোক্ষ ভুক্তভোগী। অন্নদামঙ্গলে তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়' বর্গীর হাঙ্গামা-প্রসঙ্গে। আর একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণ। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের চিত্রচম্পূ কাব্যেও বর্গীর বিবরণ আছে। এ ছাড়া আঠারো শতকের মঙ্গলকাব্য-গুলিতে পলাশীর যুদ্ধের পর সামাজিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ, মন্বন্তর, সন্ন্যাসীবিদ্রোহ বা দেবী সিংহের অত্যাচারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং একশ বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্যাস চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী এর স্মৃতি বহন করছে। মন্বন্তরের জীবন্ত বর্ণনা প্রথম বেরিয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন -প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় (১৮১৮)। পল্লীগ্রামের মানুষ সাহিত্যে এ-সব দুঃসহ স্মৃতিকে ধরে রাখতে চায়নি, তারা দৈবী লীলার কল্পিত কাহিনী নিয়েই মত্ত ছিল। অতএব সরকারি উপকরণ ছাড়া আজ আর এসব ঘটনার বিবরণ রচনা করা কঠিন।

এরকম অবস্থায় ডক্টর অণিমা মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হবে। আঠারো শতকের অমুদ্রিত পুথি থেকে তিনি এইসব সামাজিক বিপর্যয়ের সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন এবং ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা করেছেন। অণিমা মুখোপাধ্যায় মূলত সাহিত্যের ছাত্রী। পুথি পড়ায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিশ্বভারতীর বাংলাবিভাগ-সংলগ্ন পুথি-শালাটি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বহু মূল্যবান পুথি ও দলিলে সমৃদ্ধ। এতে রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন সমাজের অজস্র তথ্য সংগৃহীত। লেখিকা

দীর্ঘকাল এখানে গবেষণা করেছেন, এখনও করে চলেছেন। ইতিমধ্যে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর রাঢ়ের সমাজজীবনের একটি বিবরণাত্মক ইতিহাস পুথির সাহায্যে প্রস্তুত করেছেন। সাহিত্যের থেকে তিনি চলে এসেছেন ইতিহাসের দিকে। আমি মনে করি এতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান ও গবেষণা উত্তরোত্তর দৃঢ় তথ্যাশ্রয়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করবে। তাঁর ইতিহাস জ্ঞান ও ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা এ বইতে সুপ্রকট। পণ্ডিতেরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকলেও অপ্রকাশিত আকর পুথি অবলম্বনে আলোচনা এই প্রথম। লেখিকার গবেষণার মূল্য বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃত হবে বলেই মনে করি।

শান্তিনিকেতন
১৫ মে, ১৯৮৭

ভবতোষ দত্ত

নিবেদন

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তাঁর অক্ষম উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাংলার নবাবদের স্বাধীন শাসকের মতো আচরণ, আর এই বিশৃঙ্খলার অবকাশে সুযোগসন্ধানী ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের তৎপরতা ও পরে আধিপত্য-বিস্তার—মোটা দাগে এই হল বাংলার আঠারো শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস। এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে শতাব্দীর যে সামাজিক ইতিহাস, তা তিনটি বিশেষ ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। এক : বর্গীর হাঙ্গামা, দুই : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং তিন : সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পুঁথিতে ও পুঁথির পুষ্পিকায়, সমকালীন চিঠিপত্রে ও পরবর্তীকালে রচিত কিছু ছড়া ও গাথায় শতাব্দীর এই বিপর্যয়ের বেশকিছু কৌতূহলোদ্দীপক খবর পাওয়া যায়। এই ধরনের প্রত্যক্ষদর্শীর অনাড়ম্বর বর্ণনা থেকে সেই সময়ে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর ভয়াবহ বিড়ম্বনার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়ার একটি প্রামাণ্য চিত্র মেলে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিবেদননির্ভর প্রথাসিদ্ধ ইতিহাসে যা একেবারেই অনুপস্থিত। অবশ্য সিয়র-উল-মুতাক্ষরিণের মতো প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকের লেখায় এই তিনটি স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ রয়েছে। কিন্তু সেকালের সাধারণ মানুষ এই বিষয়গুলিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছিল, তার কোন বিশেষ উল্লেখ সেখানেও নেই। তবে পুঁথি পত্রের এই সাক্ষ্য নিতান্তই অপ্রতুল। শুধুমাত্র সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে এতবড় তিনটি স্মরণীয় ঘটনার সামগ্রিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। আর এই কারণেই বর্তমান গ্রন্থে সরকারি নথিপত্র ও ঐতিহাসিক বিবরণকে মূল কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করে পুঁথিপত্রের সাক্ষ্যে তাকে আরো তথ্যাশ্রয়ী করে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দু’-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথির পুষ্পিকায় বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামের শ্রীনন্দদুলাল দেবশর্মা নামক জনৈক লিপিকর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে সংক্ষিপ্ত অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তা অবশ্যই ইতিহাসের এক দুর্লভ সম্পদ। রামায়ণের দু’টি পুঁথির পুষ্পিকায় মন্বন্তরের পরবর্তীকালে ‘গ্রামে টোটা পড়া’ এবং শস্যে ‘সুয়া’ লাগার যে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় তা শুধু সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক নয়, সম্ভবত বিজ্ঞানীদেরও কৌতূহল উদ্রেক করবে। আবার মহাভারতের একটি পুঁথির পাতায় লিপিকর কর্তৃক বর্ণিত ফরাসডাঙার বাগবাজারে বর্গীর হাঙ্গামা সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ-দর্শীর দেওয়া যে বিবরণ, কোন সরকারি ইতিহাসে তা পাওয়া সম্ভব নয়। সেকালের সাধারণ মানুষের ওপর এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল, পুঁথিপত্রে প্রসঙ্গক্রমে সেগুলির আকস্মিক উল্লেখে তার কিছুটা আভাস থেকে গেছে।

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, বর্গীর হাঙ্গামার ছবি আমরা গঙ্গারামের ‘মহারাষ্ট্র পুরাণ’ ইত্যাদি সমকালীন গ্রন্থে পাই এবং সেগুলি ইতিমধ্যে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মতো বাংলার এমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাকে নিয়ে সমসাময়িককালে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। আমাদের আলোচ্য পুঁথিগুলি ব্যতিরেকেও ১১৭৬ বঙ্গাব্দেই লিপিকৃত এমন অনেক বাংলা পুঁথির সন্ধান আমরা পাই, যেগুলির পুষ্পিকায় সমকালীন অনেক কৌতূহলোদ্দীপক খবর পরিবেশিত হলেও মন্বন্তর সেখানে কোনরকম ছায়া ফেলেনি। মন্বন্তরের মতো এমন ভয়াবহ পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে গ্রাম্যকবি বা লিপিকরদের এই নির্লিপ্ততা খুবই বিস্ময়ের।

এইসমস্ত সমস্যার কথা বাদ দিয়েও যা পাওয়া গেছে, সেইসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা পুঁথির পুষ্পিকা ছাড়াও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজে আঠারো শতকের ইতিহাসের অনেক খবর মেলে। বাংলা

পুঁথিপত্রের এই অতি মূল্যবান আকর-উপাদান এখনও পর্যন্ত তেমন-ভাবে কেউ ব্যবহার করেননি। জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বলেই এইসব উপাদানের মূল্য অত্যন্ত বেশি। বর্তমান গ্রন্থের কিছুটা সার্থকতা বোধহয় এখানেই।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বৃত্তি নিয়ে আঠারো শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহের বৃহত্তর গবেষণা কাজে নিযুক্ত থাকাকালে সমসাময়িক পুঁথিতে আলোচ্য তথ্যগুলির সন্ধান পাই এবং সেগুলিকে উপজীব্য করে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'মাসিক বসুমতী', 'দৈনিক বসুমতী' ইত্যাদিতে প্রকাশ করি। সেই প্রবন্ধগুলিই বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হল।

পুঁথির বানান সর্বত্র অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছি এবং পাঠকের সুবিধার জন্য অধিকাংশ সময়েই উদ্ধৃত অংশগুলির ভাবার্থ করে দিয়েছি। গ্রন্থের শেষে অপ্রচলিত শব্দার্থের একটি তালিকাও সংযোজিত করা হয়েছে।

বইখানি রচনার ক্ষেত্রে আমি নানাভাবে নানাজনের কাছে কৃতজ্ঞ। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পথিকৃৎ ঐতিহাসিকদের গবেষণা ও নিষ্ঠার ফসলকে আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পর্কে পুঁথি-ভিত্তিক অনুসন্ধানের গুরুত্বের বিষয়ে আমাকে সর্বপ্রথম অনুপ্রেরিত করেন বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিবিভাগের পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আমার পরমশ্রদ্ধেয় মাস্টারমশায় ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল। পুঁথি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর কাছে যখনই গিয়েছি, উপদেশ-নির্দেশ আলাপ-আলোচনা দ্বারা সস্নেহে তিনি সকল কৌতূহল নিরসন করেছেন।

আমার পরম সৌভাগ্য এই গ্রন্থ রচনায় ডঃ ভবতোষ দত্তের মত বিদগ্ধ অধ্যাপকের নির্দেশ আমি লাভ করেছি। তিনি শুধু আমার বর্তমান পর্যায়ের গবেষণা-নির্দেশক হিসেবে নিছক নির্দেশদানেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। মূলত এই অভিভাবকপ্রতিম অধ্যাপকের অকৃপণ সাহায্য, উৎসাহ ও উপদেশ না পেলে এই গ্রন্থ কোনদিনই

প্রকাশ হ'ত কিনা সন্দেহ। তাঁর অপরিসীম ব্যস্ততার মধ্যেও সাগ্রহে গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

বিশ্বভারতীর বাংলাবিভাগের অপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমার ইতিহাস-চেতনার প্রথম সূত্রপাত। সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও তাঁর সফল ইতিহাস-গবেষণাগুলি আমার বর্তমান গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ না হলেও অবশ্যই পরোক্ষ অনুপ্রেরণা।

আমার পূজনীয় পিতৃদেব, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্রচম্পূ' কাব্যের প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ অনুবাদ করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শ্রীযুক্ত দিব্যজ্যোতি মজুমদারের বন্ধুসুলভ সাগ্রহ সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের সৌজন্যে বর্গীর হাঙ্গামা বিষয়ক চিত্রলিপিটি পুনর্মুদ্রিত হল। আমার স্বামী, বিশ্বভারতীর পল্লীশিক্ষা ভবনের অধ্যাপক শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমার গবেষণা-কর্মের প্রতিটি পদক্ষেপে একনিষ্ঠভাবে সাহায্য করে এসেছেন। বর্তমান গ্রন্থের 'নির্দেশিকা'টি করে দিয়ে তিনি আমার অনেক শ্রম লাঘব করেছেন।

গ্রন্থের প্রচ্ছদটি এঁকেছেন আমার পুত্র শ্রীমান কৌশিক মুখোপাধ্যায়। প্রুফ দেখে দিয়েছেন শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ তাঁদের পুঁথি-বিভাগের পুঁথিপত্র ও দলিলগুলি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন। 'সাহিত্যলোকে'র কর্ণধার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ঘোষ বইখানির প্রকাশনা সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এঁদের সকলকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও শেষমুহূর্তে সামান্য কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ

চোখে পড়েছে। যেমন—৪৩ পৃষ্ঠার ২৬ ছত্রে 'নেমে'র পরিবর্তে 'নিয়ে', ৫৮ পৃষ্ঠার ২৪ ছত্রে 'পুত্রপরিবারের' শব্দ দু'টি একত্র না হয়ে পৃথকভাবে এবং ১১১ পৃষ্ঠার ১ম ছত্রে **'and'** এর স্থলে **'had'** পড়তে হবে। এ ছাড়াও দ্রুততার অনবধানে আরও দু-একটি ভুল থাকতে পারে। এজন্য পাঠক সাধারণের কাছে আমি অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা করি।

১লা শ্রাবণ, ১৩৯৪

বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তিনিকেতন

অনিমা মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধসূচি

চিত্রসূচি

বর্গীর হাঙ্গামা

এদেশে বর্গীর হাঙ্গামার আগে বাংলার সাধারণ মানুষ মহারাষ্ট্রের নামও জানত বলে মনে হয় না। সুতরাং কোন্ পরিস্থিতিতে, কোথায়, কখন মারাঠা শক্তির উত্থান হল, তার প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটল, বিভিন্ন রাজ্যের ওপর তার প্রতিক্রিয়াই বা কিরকম হল, বাংলার জনগণের কষ্ট-ক্লিষ্ট জীবনের দিনগত পাপক্ষয়ের সঙ্গে আপাত-সম্পর্কহীন এসব ব্যাপার তাদের চিন্তা-চেতনায় কোন স্থানই পায়নি নিশ্চয়ই। এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বা ব্যবস্থাপনা গ্রহণের দায়-দায়িত্ব ছিল শুধু সুবা বাংলার শাসনকর্তাদের। এ ছাড়া, ধন-প্রাণ রক্ষার দায়ে আরও কিছু লোককে এই মারাঠা-বিপদের খবর জানতে হয়েছিল। তাঁরা হলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদার ও বিদেশী বণিকগোষ্ঠী।

তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়। একদিকে মুসলমান শক্তির পতন শুরু হয়েছে, অন্যদিকে ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি পর্ব চলছে। এই বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থার একদিকে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ, অন্যদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন—এক চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছিল মারাঠা শক্তিকে তার সর্বভারতীয় বিস্তারের। আর এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করে মারাঠা শক্তি এক ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতা চালিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে তাদের অধিকার বিস্তার করতে সচেষ্ট হল। এই সময় এক দীর্ঘকাল জুড়ে বাংলার জাগ্রত বিভীষিকা হয়ে দেখা দিয়েছিল বর্গীর হাঙ্গামা। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবছর বর্গীরা বাংলায় এসেছে। গ্রাম-নগর আক্রমণ করে, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অত্যাচার ও অপহরণ করেছে। কখনও তাদের অর্থ দিয়ে শান্ত করা হত, কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হত—এ ইতিহাস দীর্ঘ ন'বছরের। কিন্তু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে নির্বিচারে ধন-সম্পদ সংগ্রহের সর্বগ্রাসী লোভ মারাঠাদের কাল হয়েছিল মনে

হয়। কারণ, তাদের সম্পদ সংগ্রহের পথটি ছিল নিতান্ত নগ্ন ও স্থূল। প্রথমদিকে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যা সমেত সর্বপ্রকার দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন তথা সন্ত্রাস সৃষ্টি, এবং পরে প্রচুর পরিমাণে চৌথ বা রাজস্ব ও সরদেশমুখীর দাবি আদায় করতে চেষ্টা করে, তারা দেশের সর্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দের এই আক্রমণকে কেন বর্গীর হাঙ্গামা বলা হয়—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, মারাঠা শব্দ 'বার্গীর' থেকে 'বর্গী' কথার উৎপত্তি। নিম্নতম মানের মারাঠা সৈন্যদের 'বার্গীর' শব্দে অভিহিত করা হত। অত্যন্ত নিম্নমানের বেতনে এদের কাজে নিযুক্ত করা হত বলে, যুদ্ধের সময় এদের লুণ্ঠন ও ধর্ষণের অবাধ অধিকার দেওয়া হত। আর এরা এই সুযোগ লাভ করবার জন্য সব সময়ে সরকারী বাহিনীর পুরোভাগে থাকত। বাংলায় এই সৈন্যদের উৎপাত বা হাঙ্গামাই 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে পরিচিত।

কিন্তু মারাঠারা তো দস্যু ছিল না। তবে ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বারবার কেন তারা এদেশে এসে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে গিয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, বাংলা সুবায় অত্যাচার করবার তাদের ছিল আইনসঙ্গত বাদশাহী অধিকার। আর এই বাদশাহী অধিকারের ফলই বর্গীর হাঙ্গামার প্রকৃত কারণ। আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, কেন্দ্রীয় মারাঠা রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন আঞ্চলিক মারাঠা শক্তিকেন্দ্র প্রস্তুত হচ্ছিল আঠারো শতকের প্রথম দশক থেকেই। এক-একটি কেন্দ্রের এক এক-জন শক্তিমান জায়গিরদার সেনানায়ক রাজধানী সেতারার প্রতি আনুগত্য জানিয়ে চৌথ ও সরদেশমুখী সরবরাহ ও সামরিক সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে, যে যার নিজের এলাকার প্রকৃত বিধাতা হয়ে উঠেছিলেন। ফলে, সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভিন্ন রাজ্যে সামরিক অভিযান চালাতে সব সময় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেরও প্রয়োজন হত না। সেতারায় মারাঠারাজের ওপর পেশোয়ার রাজ-

নৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে, এইসব অঞ্চল-প্রধানদের একদিকে যেমন তাঁর সঙ্গে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অপর-দিকে তেমনি নতুন পেশোয়া নির্বাচনেও এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট কাজ করত। নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলে ছিলেন এইরকম এক-জন প্রবল প্রতিপত্তি সম্পন্ন আঞ্চলিক সেনানায়ক। বাংলা-সহ পূর্বাঞ্চল ছিল তাঁর প্রভাবাধীন এলাকা। মারাঠারাজ শাহু তাঁকে বিশেষ সমীহ করে চলতেন। এদিকে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে নতুন পেশোয়া মনোনীত হলেন বালাজী বাজীরাও, রঘুজী ও অপর কয়েকজন প্রবীণ মারাঠা নায়কের বিরোধিতা সত্ত্বেও। ফলে উনিশ বছরের যুবক, সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও প্রভুত্বকামী বালাজী বাজীরাওয়ের সঙ্গে রঘুজী ভোঁসলের সম্পর্ক শুরু থেকেই বৈরিতায় তিক্ত হয়ে উঠল।

এই পরিস্থিতিতে সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে সুবা বাংলার মসনদ অধিকার করেন বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ।

মুর্শিদকুলি খাঁ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে বাংলার নবাব নিযুক্ত করে গেলেও, সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দিন নিজেই এর বিরোধিতা করেন এবং অনুগত আমলাদের সহায়তায় ও চক্রান্তে বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। এই চক্রান্তে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁর অনুগত আলিবর্দী খাঁও। আলিবর্দী খাঁর এই উপকারের জন্য ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে বিহার যখন বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তিনি বিহার অধিকার করে নিজের প্রতিনিধি আলিবর্দীকে বিহারের নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেন।

দেশশাসন ব্যাপারে সুজাউদ্দিন তাঁর নিকট আত্মীয় হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দী খাঁ এবং জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রমুখের উপদেশ অনুসরণ করে চলতেন এবং নিয়মিতভাবে দিল্লীতে রাজস্ব ও উপঢৌকন পাঠাতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ বাংলার নবাব হয়ে প্রথমদিকে দেশ শাসন বিষয়ে পিতার অনুসরণ করলেও, পরে

তাঁদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ফলে প্রভাবশালী আমলারা মিলে এক কূট চক্রান্তে সরফরাজকে গদিচ্যুত করে বাংলার মসনদে আলিবর্দী খাঁকে বসাতে চান। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট মহম্মদ শাহর কাছ থেকে এক মনোনয়নপত্র আনেন। এবং এই পথে আলিবর্দী সরফরাজ খাঁকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে।

নিহত নবাবের অনুগত আফগান নায়কেরা এই পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারল না। ফলে উড়িষ্যায় বিদ্রোহ দেখা দিল। সরফ-রাজের অন্যতম সেনাপতি মীর হবিব আলিবর্দীর বিরুদ্ধে রঘুজী ভোঁসলের সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করলেন। রঘুজী এই সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করলেন না।

এদিকে মসনদে বসেই আলিবর্দী খাঁ ভূতপূর্ব নবাবের কোষাগার দখল করে প্রাপ্ত ধনরত্ন থেকে এককোটি টাকা ও বহুমূল্যের রত্নাদি দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মহম্মদ শাহও খুশী হয়ে আলিবর্দীকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে, যে কোন কারণেই হোক, সম্রাট আলিবর্দীর উপঢৌকনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মুরাদ খাঁ নামক এক কর্মচারীর মাধ্যমে প্রাক্তন নবাবের সমস্ত ধনরত্ন ও দু'বছরের বকেয়া রাজস্ব দাবি করে পাঠান। কিন্তু আলিবর্দী মুরাদ খাঁকে উৎ-কোচে বশীভূত করে রাজস্বের কোনরকম মীমাংসা না করেই, মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা ও কিছু টাকা মূল্যের রত্নাদি দিয়ে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সেই থেকে তিনি দিল্লীতে রাজস্ব-প্রেরণ বন্ধ করে, বাংলার স্বাধীন শাসকদের মত আচরণ করেন। সুতরাং দিল্লীর মহা-মান্য বাদশাহ কৌশলে সুবা বাংলার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। তিনি মারাঠা রক্ষাকবচের বিনিময়ে মারাঠা রাজা শাহুকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার তথা সুবা বাংলার জন্য বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টাকার চৌথ দান করলেন। শর্ত হল, এই চৌথ শাহুরাজকে নিজের বাহুবলে

আদায় করে নিতে হবে। শাহুরাজ এই চৌথ দান করলেন রঘুজী ভোঁসলেকে। এদিকে দিল্লীর বাদশাহ এই চৌথ আদায়ের খবরটি যথা-সময়ে পেশোয়া বালাজী বাজীরাওকেও জানিয়ে দিলেন। ফলে বাদ-শাহের এই কূটনৈতিক চালের শিকার হয়ে উঠল বাংলা সুবা। এবং বাদশাহী আদেশের ফলস্বরূপ দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী লুণ্ঠনকারী মারাঠা সৈন্যবাহিনীই বাংলায় এল আইনসঙ্গত বাদশাহী অধিকার নিয়ে, বাংলা থেকে বাহুবলে চৌথ আদায় করতে। তারা অত্যাচারে অনাচারে বাংলার জনজীবন দুর্বিষহ করে তুলল। এই অবস্থা চলেছিল দীর্ঘ আট-নয় বছর ধরে।

এই বর্গীর হাঙ্গামার বিস্তারিত বিবরণ আমরা প্রধানত দু'টি পুঁথি থেকে দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী কবির বর্ণনায় পাই। এঁদের মধ্যে মহা-মহোপাধ্যায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত 'চিত্রচম্পূ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থটিতে ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম বর্গীর হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আর গঙ্গারাম রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' নামক পুঁথিখানি থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের বর্গীদের শেষ হাঙ্গামার অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী ও সেই সঙ্গে কৌশলে ভাস্কর পণ্ডিতের জীবনাবসান ঘটানোর রোমাঞ্চকর কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা পাই। এছাড়া, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও, বর্গীর অত্যাচারের তীব্রতার পরিচয় না মিললেও, কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। অজ্ঞাত লেখকের রচিত 'মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা' নামে একটি খণ্ডিত ক্ষুদ্রাকার পুঁথি থেকে বর্গীদের বাংলায় প্রবেশ ও পর পর কোন্ জেলা থেকে কোথায় গিয়েছিল, তাদের আগমনে ইংরেজ সমেত সমস্ত দেশবাসীর পলায়ন, মীর হবিবের বর্গী-দের সঙ্গে যোগদান ইত্যাদি বহু ঘটনারই ইঙ্গিত সেখানে রয়েছে। এছাড়া, সামান্য হলেও দু'একটি পুঁথির পুষ্পিকায় এবং কিছু চিঠিতে বর্গীদের উৎপাতের উল্লেখ মেলে। সাম্প্রতিকতম কালে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতেও বর্গীর হাঙ্গামার উল্লেখ মেলে। আর মেলে বীরভূম জেলার কয়েকটি গ্রামে অনুসন্ধান করে কিছু ভগ্ন স্মৃতি-

চিহ্ন ও কিংবদন্তির খবর। আমরা একে একে এদের নিয়ে আলোচনা করব।

অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। মহাকবি ভারতচন্দ্রের উত্থানও মোটামুটি এই সময়েই। কবি ভারতচন্দ্রের অসামান্য কাব্যপ্রতিভার কাছে বাণেশ্বরের শাস্ত্রজ্ঞান ম্লান হয়ে গেল। ফলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকেই সভাকবির মর্যাদায় বরণ করলেন। বাণেশ্বর গভীর ক্ষোভে নদীয়ারাজের আশ্রয় ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দীর দর-বারে উপস্থিত হলেন মর্যাদাপূর্ণ আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু আলিবর্দীর রাজনৈতিক অবস্থা তখন বিপর্যস্ত। তিনি সবেমাত্র গিরিয়ার যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খাঁকে নিহত করে শাসনযন্ত্রকে আয়ত্তে এনে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ অনুপ্রাস অলংকারে ভূষিত কাব্যরস উপভোগের মত নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব অবকাশ তাঁর তখন ছিল না। তাই তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত করে যথাযোগ্য সম্মান দানে অক্ষম হলেন। এই অবস্থায় হতাশ হয়ে বাণেশ্বর যখন দেশান্তরী হবার কথা ভাবছেন, এমন সময় বর্ধমানরাজ চিত্রসেন তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিপুল সমাদরে নিজ রাজ্যে আহ্বান করে সভাকবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাণে-শ্বর চিত্রসেনের সভায় ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ঐ সময় চিত্রসেন পরলোকগমন করলে বাণেশ্বর আবার নদীয়ায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হন। সেখানে কিছুকাল থেকে বাণেশ্বর কলিকাতায় শোভা-বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১] এই বর্ধমান-রাজের সভাকবি হিসেবেই তিনি ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানে বর্গীর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এবং বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের কীর্তি-গাথা 'চিত্রচম্পূ' কাব্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রত্যক্ষদর্শীর অভি-জ্ঞতাপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বর্গীর হাঙ্গামার সেই প্রথম পর্বে, বর্ধমান সহরের জন-জীবনের ওপর তাদের অত্যাচারের খবর খুব

বিস্তারিতভাবেই আলোচ্য কাব্যটি থেকে পাওয়া যায়।

মহারাজ চিত্রসেন যেমন আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক, তেমনি গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মহারাজার কল্পিত মৃগয়াভিযান এবং তারই অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে বর্গীর হাঙ্গামার ভয়াবহ বাস্তব বর্ণনা। এই প্রসঙ্গেই, 'খণ্ড প্রলয় বিধিৎসু' 'সর্বসর্বস্বাপহরণ স্বেচ্ছা বিহরণ প্রতিষিদ্ধাচরণমাত্রনিপুণ' 'কৃপাকৃপণ' 'প্রচণ্ডশীল' 'বর্গিবর্গ' মহাধূমকেতুর মত মহারাজ শাহুর বিপুলবাহিনীর বঙ্গে আগমন, প্রজাবর্গের ভীতি ও মহারাজ চিত্রসেন কর্তৃক তাদের আশ্রয়দানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

বর্গীর দলের সেই প্রথম বর্ধমানে আগমনের বর্ণনায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার লিখেছেন[১]—

"প্রজানুরঞ্জক মহারাজাধিরাজ চিত্রসেনের রাজত্বকালে সূর্য যখন মেষ রাশিতে সঞ্চরণ করিতেছেন, তখন মহাপ্রভঞ্জের মত প্রচণ্ড সূর্যকে আবরিত করিয়া তমোময় তমাল তরুর ন্যায় ধূলিজাল দিবাকে রজনী সদৃশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মনে হইল কলিকালে পাপসমূহের মত নিষ্ঠুর খড়্গহস্ত নিশাচর, সকলের যথাসর্বস্ব অপহরণ, যথেচ্ছ ভ্রমণ এবং নিষিদ্ধকার্যে পারদর্শী ইহাদের কবল হইতে গর্ভবতী, শিশু, বালক এবং দ্বিজ অথবা দীনহীন কাহারো রক্ষা নাই। প্রবল সৈন্যদলের কোলাহলে, অশ্বের হ্রেষারবে, বৃংহতির প্রচণ্ড চিৎকারে, ভেরীর ভয়ঙ্কর নিনাদে, খড়্গের ঝনঝনানিতে ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া মহারাষ্ট্র মহেন্দ্র শাহু রাজের সৈন্যদল বিজয়ীর সিংহনাদ ও বিবিধ ভৈরব রবে ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া গৌড়জনপদবাসীদের সমূলে নির্মূল করিবার জন্য ধূমকেতুর মত উপস্থিত হইল।"

এই অপূর্ব সুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে বর্গীর হাঙ্গামার সূচনাপর্বের ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী রূপ 'চিত্রচম্পু' কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। কবিকে অনুসরণ করে সে বর্ণনায় আর একটু অগ্রসর হওয়া যাক।

"তাহারা দিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করে, অস্ত্রহীন, দীন,

স্ত্রীলোক ও বালকদের অত্যাচার ও হত্যা করে। সকল ধনসম্পদ ও সেই সঙ্গে সাধ্বী স্ত্রীলোকদেরও অপহরণ করে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারা গোপনে দেশান্তরে নিভৃত প্রদেশে ধাবিত হয়। অদ্ভুত বেগশালী অশ্বকুল ইহাদের প্রধান বল।"

"তাহাদের এইরূপ স্বভাবচরিত্র লোক-বিশ্রুত। তদুপরি এখন স্বভাবদুর্দম এই বর্গীদের সম্মিলিত সৈন্যসাগর দেখিয়া স্বভাবভীরু ও ভঙ্গুর গৌড় জনপদবাসী প্রজাগণের মধ্যে এইরূপ বিরাট কোলাহল উপস্থিত হইল—কি কর্তব্য, কোথায় যাই, কোথায় থাকি, কি উপায় করি, কে আমাদের সহায়? হা ভগবান। কি দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইল! সে যেন দিকে দিকে অকস্মাৎ অলৌকিক প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড বজ্রের আঘাতে পর্বত খণ্ডিত হইয়া পড়িবার ভীষণ শব্দ, সে যেন মন্থর পর্বতের উদ্দাম মন্থনবেগে আন্দোলিত মহাসাগরের জলরাশির কল্লোল-ধ্বনি। সে উত্থিত ভয়ঙ্কর শব্দ যেন এমন গভীরভাবে দিঙমণ্ডল ও ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের আকাশকে পূর্ণ করিয়া দিল, যে অন্য শব্দ গ্রহণের আর কোন অবসর রহিল না।"

"তখন মহাধনিগণ শকট, শিবিকা, গজ, অশ্ব, পাল্কী, নৌযান ও উষ্ট্রসমূহে আরোহণ করিয়া ধাবিত হইল। তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে দিক্‌চক্রবাল ব্যাপ্ত করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও যেমন আশাচক্রে চালিত হইয়া অগ্রসর হয়, তদ্রূপ ধনজন-ভারে মন্থরগতি হইয়াও তাহারা অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সঙ্গে গৃহের সারবস্তু বস্ত্রালঙ্কার ও বাসনপত্র লইয়া চলিতে লাগিলেন। কোলে চঞ্চল বালক, কণ্ঠে বিলম্বিত শালগ্রামশিলা, সঙ্গে বহুকষ্টে সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থের দুর্বহ মহাভার, হৃদয়ে সেই সঞ্চিত গ্রন্থরাজির মহাবিনষ্টির সমূহ আশঙ্কা। স্ত্রীলোকেরাও চলিতে লাগিলেন। কেহ গর্ভভারে, কেহ কেহ নিতম্ব ও স্তনযুগলের ভারে অলসমন্থর গমনা। পায়ে পায়ে সংকট ও কণ্টকভারে তাঁহারা বিস্ফারিত-লোচনা ও আতঙ্কিত। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের ক্রমবর্ধমান তীব্র তাপ

সহ্য করিতে না পারায় এবং যথাসময়ে পানাহারের অভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর শিশুদের করুণ ক্রন্দন ও আর্ত চিৎকারে ব্যথিত ও কাতর-হৃদয় তাঁহারা ব্যাকুল করুণ স্বরে বিবিধ আর্তনাদ, বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন বিশ্বসৃষ্টিই বর্গীময়। সকলের সম্মিলিত আর্তনাদে ভূমণ্ডল যেন বিক্ষুব্ধ হইল।"

"এই সময় মহারাজ চিত্রসেন সচিব-প্রধানের উপর বর্ধমান নগরীর নিরাপত্তার ভার অর্পণ করিয়া, দিঙ্‌মণ্ডলব্যাপী মহাবিক্রমশালী সৈন্য-বাহিনী দ্বারা ভূমিবলয় আচ্ছাদিত করিয়া অনন্যপরায়ণ শরণাগত, করুণাস্পদ দরিদ্র ও দ্বিজপ্রধান প্রজাকুলের নিরাপত্তা বিধানের কারণে নিজ অধিকৃত ভূভাগ ত্রিবেণী ও সাগর সঙ্গম নামক তীর্থদ্বয়ের মধ্যভাগে 'বিশালা' নামক নগরীতে গমন করিলেন।"*

এই বর্ণনা থেকে সন্দেহ হয়, তবে কি মহারাজা চিত্রসেন ভয়ার্ত প্রজাগণকে সঙ্গে করে অন্যান্য অনেকের মতই কলকাতায় পলায়ন করে-ছিলেন? অসম্ভব নয়।

বাণেশ্বরের এই রচনার বিবরণের সত্যতা প্রমাণ করে কোম্পানির কাগজপত্র। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি মারাঠা আক্রমণের খবর লণ্ডন অফিসকে জানাতে গিয়ে লিখছে—"আমরা কাশিম-বাজারের স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের কাছ থেকে গত ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল খবর পেয়েছি যে কাশিমবাজারে মারাঠা আক্রমণ হতে পারে। বর্ধমান, রাধানগর ও অপরাপর অঞ্চল থেকেও আমাদের ব্যবসায়ীরা এই খবরই এনেছে।"

গঙ্গারামেব 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' পুঁথিখানির রচনাকাল ১১৫৮ বঙ্গাব্দ। সুতরাং বলা যায়, ঘটনার একেবারে সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্যটিও রচিত হয়েছিল। পুঁথিটির 'পুষ্পিকা' অংশে রয়েছে—"ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে

* আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য অংশটুকু অনুবাদ করে দিয়েছেন।

প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব। সকাব্দা ১৬৭১, সন ১১৫৮ সাল॥ তারিখ ১৪ পৌস রোজ শনিবার।"[৩]

আলোচ্য কাব্যখানির নাম যেহেতু 'মহারাষ্ট্র পুরাণ', সেই কারণেই সম্ভবত কবি কাব্যারম্ভে পৌরাণিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন—পৃথিবী নানা পাপে পরিপূর্ণ এবং মানুষের নৈতিক অবনতি তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনায় হিংসা-দ্বেষে কাতর মানুষ ঈশ্বরচিন্তাও ভুলতে বসেছে।

"রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা,
রাত্র দিন ক্রুড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শ্রিঙ্গার কৌতুকে জিব থাকে সর্ব্বক্ষণ,
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে,
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥"[৪]

এই পাপে পরিপূর্ণ ধরা থেকে মুক্তিলাভের জন্য পৃথিবী স্তব করলেন ব্রহ্মার। ব্রহ্মা পৃথিবীকে নিয়ে গেলেন শিবের কাছে। শিব এর প্রতিকারের একটি উপায় স্থির করে নন্দীর মাধ্যমে উপদেশ দিলেন—

"নন্দীকে ডাকীয়া সিব বলিছে বচন।
দক্ষিন সহরে তুমি জাহ ততক্ষন॥
... ...
এতেক যুনিঞা নন্দি গেলা সিগ্রগতি।
উপনিত হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি॥
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেক দিন হইল বাঙ্গালার চৌত না দেএ মোরে॥
... ...
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে।
দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে॥

জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে।
চৌথের কারণে লোক পাঠায় তথাতে॥"[৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে বাংলার রাজস্ব দু'বছর দিল্লীতে পাঠান হয়নি। এবং বাংলার নবাবের এই ঔদ্ধত্য দিল্লীর বাদশাহের কাছে অসহনীয় মনে হয়। তিনি সেই রাজস্ব তথা চৌথ আদায়ে লোক পাঠাবার ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে ওঠেন। এই দিল্লীর সম্রাট ছিলেন তখন মহম্মদ শাহ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলিবর্দী বিদ্রোহী হয়ে যখন সরফরাজ খাঁর হাত থেকে বাংলার মসনদ কেড়ে নেন, সেই সময়ে বাংলার রাজস্ব দু'বছর দিল্লীতে যায়নি। আর মহারাষ্ট্র তখন বাংলার রাজস্বের এক-চতুর্থ অংশ পেত। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহর কাছে সেই চৌথ দাবি করে পাঠালে, বাদশাহ আপন দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মানসে মারাঠা ছত্রপতি দ্বিতীয় শিবাজীকে বা শাহু রাজাকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জন্য বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টাকার চৌথ দান করেন।

"তবে দুত বিদাএ হইলা তরিতে।
সিগ্রগতি য়াসি পহুছিলা সেতারাতে॥
... ...
পত্র পড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে॥
জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।
দুই বৎসর হইল খাজানা না দেএ তারে॥
আজ্ঞা দিলা বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।
চৌথাই নেএন জেন জবর করিঞা॥
এতেক সুনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোনজনাকে পাঠাব মুলুক বাঙ্গালাতে॥
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥

আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই
জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই ॥
তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।
তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্করণ ॥
রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।
তৎকাল করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে ॥"[৬]

এই ভাস্কর পণ্ডিতের পরিচালনায় বর্ধমান সহরে বর্গীর দল এসে পৌঁছেছিল বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে—'জবর করিঞা' অর্থাৎ বাহুবলে চৌথ আদায় করতে।

"বদ্দমান সহরে রানির দিঘির পরে
নবাব আছে সেইখানে।
দুত মুখে সুনি কথা ভাস্কর চলিল তথা
লস্কর লইয়া নিসাতে।
লস্কর নিসব্দে জাএ কেহু নাহি জানে তাএ
আইলা বৈসাখ উনিশাতে ॥
... ...
বিরভুই বামে থুইয়া গোআলা ভুইএর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বদ্দমানে।"

ভাস্করের সঙ্গে ছিল চল্লিশ হাজার ফৌজ, তাঁর কার্যসিদ্ধিতে সহায়তা করতে।

"চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিস হাজার ফৌজ লইঞা।"

ভাস্কর বর্ধমানে পৌঁছেই নবাবকে খবর পাঠান—চৌথাই না দিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। রাজ্যপাট, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সব রসাতলে যাবে।

সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে
তেকারনে আইলাম আমি।

... ...

চোথাই না দিবে জবে রায্য নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রন ॥"[৭]

এদিকে আলিবর্দী উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করে সবেমাত্র বাংলায় ফিরেছেন, তখনই এই দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদের আরও কারণ এই যে, নবাবের মূল সৈন্যবাহিনী আগেই মুর্শিদাবাদের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর নবাবের সঙ্গে রয়েছে মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিক। মেদিনীপুরের কাছাকাছি এসে আলিবর্দী শুনলেন যে, মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহীর পরিচালনায় ভাস্কর পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তিকে বাংলায় পাঠিয়েছেন চৌথ আদায় করবার জন্য। আলিবর্দী চেয়েছিলেন রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে তিনি মারাঠাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। কেননা মারাঠারা ইতিমধ্যেই বিহার অতিক্রম করে পাঞ্চেতের ভিতর দিয়ে বর্ধমানে প্রবেশ করেছে। চলার পথে হত্যা-লুণ্ঠন চলে যথারীতি। আলিবর্দী রাজধানীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু মাঝপথে বর্ধমানের রানীদীঘির কাছে অতর্কিতে বর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হন। নবাব আলিবর্দী প্রমাদ গণলেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঐ সামান্য শক্তি নিয়েই মারাঠাদের গতিরোধ করলেন। আর রাতের অন্ধকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্যুদ্‌গতি মারাঠা ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায়, আপাতত মারাঠা-বিতাড়ন মাথায় রেখে, কোনরকমে রাজধানীতে ফিরে যাওয়াই হল তাঁর একমাত্র চিন্তা।

নবাব তাঁর পারিষদদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন চৌথ দেওয়ার ব্যাপারে। স্থির হল চৌথ দিতে যে টাকা ব্যয় হবে, সেই টাকা সিপাইদের বকেয়া বেতনে ব্যয় করা হোক, তারা লড়াই করে ভাস্কর পণ্ডিতকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।

"জতেক সরদার ছিল তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে।
আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে
দেসে জেন আইস্তে নাই পারে॥
বরগি সব মারিব দেসে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে॥"[৮]

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ হল না। অতর্কিতে নবাবের শিবির বর্গী কর্তৃক আক্রান্ত হল।

"একদিন দুইদিন করি সাত দিন হইল।
চতুর্দিগে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥
মুদি বানীঞা জত বারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারেছমুতে পাএ জারে॥
বরগির তরাসে কেহু বাহির না হএ।
চতুর্দ্দিগে বরগির ডরে রসদ না মিলএ॥
... ...
পিছাড়ি লুটিল বরগি আসি য়ার কত।
পোড়াইল ডেরাডাণ্ডা তাম্বু জত॥
খাজানার গাড়ি জত সাতে ছিল।
চাইর দিগে বরগি য়াইসা লুটিতে লাগিল॥
হাতি ঘোড়া কত লুইটা লইয়া জাএ।
বড় বড় সিপাই জত উমনি পলাএ॥
... ...
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাএ।
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ॥
... ...
কলার আইঠা জত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খাএ সিজাইয়া॥

ছোট বড় লস্করে জত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল।
বিসম বিপত্য বড় বিপরিত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাবসাহেব খাইল॥"[৯]

অতঃপর অতিকষ্টে মারাঠা-ব্যূহ ভেদ করলেন আলিবর্দী। তারপর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে এসে পৌঁছলেন মুর্শিদাবাদের পথে কাটোয়াতে। মারাঠারা পিছন দিক থেকে নবাব বাহিনীকে হয়রান করতে করতে হঠাৎ হানা দেয় মুর্শিদাবাদে। রাজধানী অবাধে লুণ্ঠিত হল। পলায়ন-পর্ব শুরু হয়ে গেল সেখানেও। প্রভাবশালী একটি ব্যক্তিও আর মুর্শিদাবাদে বা কাশিমবাজারে ভরসা করে থাকতে পারল না। অন্য মানুষ তো যেমন-তেমন, জগৎশেঠের মত বিখ্যাত লোকের পক্ষে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাঁর মহিমাপুরের বিশাল বাড়ি, টাঁকশাল—আকৃতি ও প্রকৃতিতে বর্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। বর্গীদের লক্ষ্য হল সেই বাড়ি। ভাগীরথী অতিক্রম করে বর্গীরা মুর্শিদাবাদ সহরে লুঠপাট আরম্ভ করে।

"তবে বরগি পার হইলা হাজিগঞ্জের ঘাটে।
সিগ্রগতি আইসা জগত সেটের বাড়ি লুটে॥"[১০]

জগৎশেঠের কুঠি ও বাড়ি লুঠ করে তারা দু'কোটি টাকা ও অনেক বহু-মূল্য দ্রব্য হস্তগত করল। ইংরেজদের কয়েকখানা নৌকাও লুঠপাট করে নিয়ে গেল। নগদ টাকা যেখানে যা পেল সব ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেল।

"আড়কাট টাকা জত ঘরে ছিল।
ঘোড়াড় খুরচি ভইরা সব টাকা নিল॥"[১১]

জগৎশেঠের বাড়ি লুঠ করে তারা এত বেশি টাকা ও ধনরত্ন পেয়েছিল যে, পাছে কারোর কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেই ভয়ে আগেই কিছু টাকা পথে ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পালিয়ে যায় গঙ্গা পার হয়ে। আর সাধারণ মানুষ সেই পথে ছড়িয়ে দেওয়া

টাকা কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

"তবে সও দুই তিন টাকা ছিটাইঞা
সিগ্রগতি গেলা বরগি গঙ্গা পার হইয়া ॥
তবে ফকির-ফকীরা গিরস্ত জত ছিল।
সেই সব টাকা তারা লুটিতে লাগিল ॥"[১২]

অবিলম্বে নবাবের কাছে এ-খবর পৌঁছল। নবাব কাটোয়া ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে এলেন। ভাস্কর তখন কাটোয়াতে পালিয়ে যায় এবং আলিবর্দী রাজধানীতে পৌঁছবার আগেই তারা পিছু হটে, তারপর সহজেই অধিকার করে নেয় অরক্ষিত কাটোয়া।

"তবে কাটঞাতে নবাব সাহেব সুনিল।
জগত সেটের বাড়ি বরগি লুইটা গেল ॥
এতেক কথা জদি হরকারা কহিল।
কাটঞা হইতে নবাব সিগ্র চলিল ॥
রাতারাতী তবে নবাব আইলা মোনকরা
ভোর হইতে হইতে তবে পহচিলা ডেরা ॥
তবে হাজি সাহেবকে নবাব য়নেক বুলিল।
এতেক লস্কর রইতে বাড়ি লুইটা গেল ॥
নবাব সাহেব জদি আইলা কীল্লাতে।
তবে সব বরগি জড় হইল কাটঞাতে ॥"[১৩]

কাটোয়াতে স্থাপিত হয় মারাঠাদের মূল ঘাঁটি। এরপর দ্রুত রাজমহল থেকে মোদনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, লুঠপাট ও অত্যাচারের অবাধ অধিকার।

কিন্তু যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া বা যুদ্ধ জয় করা মারাঠাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তরবারির জোরে গ্রাম-নগর লুণ্ঠন করা, দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা,—যাতে করে বাংলার নবাব চৌথদানে রাজি হন। এই অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে গঙ্গারাম লিখেছেন—

"তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।*
সোনার বাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধ বণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥"[১৪]

প্রাণভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ সব ছেড়ে পথে পা দেবার সময় যার যতটুকু সম্পদ আছে সঙ্গে নিয়ে চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষায়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা, যাঁরা পথে হাঁটতে একান্ত অনভ্যস্ত, তাঁরাও আজ তাঁদের শেষ সম্বলটুকু মাথায় চাপিয়ে পথে নেমেছেন।

"সঙ্ক বণিক পলাএ করাত লইয়া জত।
চতুর্দিগে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্তইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুসের স্ত্রিলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইলা মাথে॥
... ...
গোশাঞি মোহন্ত জত চোপালাএ চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া॥
... ...
সেক সৈইয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল
বরগির নাম স্তইনা সব পলাইল॥"[১৫]

---

* বাণেশ্বরও তাঁর কাব্যে পুঁথির ভারে বিভ্রান্ত পলায়নপর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বর্ণনা দিয়েছেন একইভাবে।

সবচেয়ে কষ্ট হয় বোধহয় সন্তানসম্ভবা রমণীদের। দীর্ঘপথ অতিক্রমণের সামর্থ্য নেই। অথচ না গেলেও নয়। বর্গীরা যে এসে গেছে। আজ তাদের সব আবরু, সব সঙ্কোচ ঘুচে গেছে। পথের ধুলাই আজ তাদের একমাত্র আবরণ।

"গর্ভবতি নারি জত না পারে চলিতে।
দারুন বেদনা পাইয়া প্রসবিছে পথে॥"[১৬]

এদের করুণ অবস্থার বর্ণন৷ দিয়েছেন সহৃদয় কবি বাণেশ্বরও।

এইভাবে পলায়নপর জন-সমুদ্রের সকলেই যে বর্গীর দল অথবা তাদের অত্যাচারের ফল প্রত্যক্ষ করেছে এমন নয়। অধিকাংশ লোকই পালিয়েছে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে। সকলকে পালাতে দেখে তারাও পালাচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি যে, এই আতঙ্ক বা সন্ত্রাস সৃষ্টিই ছিল বর্গীদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে কবির কৌতুককর উক্তি—

"দস বিস লোক য়াইসা পথে ডাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বোলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥"[১৭]

অনেকসময় পথিমধ্যে এইসব পলায়নপর মানুষের ওপরও বর্গীর হামলা হয়েছে। গ্রামে প্রবেশের মুখে বর্গীরা এইসব পলায়নপর মানুষদের যার কাছে যা পেয়েছে সব কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে, তবে গ্রামে ঢুকেছে। উদ্দেশ্য একই। লুঠপাট। সঙ্গে চলে অকথ্য অত্যাচার।

"ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল॥
চাইর দিগে লোক পলাএ ঠাঞি ঠাঞি।
ছত্তিস বর্ণে লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥
এইমতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে॥

মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরান॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেএ তার গলাএ॥
একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি সব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটীয়া বরগি গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইলা সব॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিগে বরগি বেড়াএ লুটীয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠ মোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রুপি দেহ রুপি দেহ বোলে বারে বারে।
রুপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগি পখইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ॥
এই মতে বরগি কত বিপরিত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তবে প্রানে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেএ বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রানে মরে॥[১৮]

এই বর্গীর আক্রমণে কোন্ কোন্ গ্রাম বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হয়ে গিয়ে-

ছিল, তারও বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই গঙ্গারামের কাব্যের বর্ণনা থেকে। কবি যে-সব উপদ্রুত অঞ্চলের গ্রামের নামের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, তাতে বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলি, ইত্যাদি জেলার বহু গ্রামের নাম রয়েছে।

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়েই বর্গীদের আগমন-বার্তা দাবাগ্নির মত কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতে পৌছল। বীরভূম ধ্বংস করে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে—এ খবর রাষ্ট্র হতে সময় লাগল না। আর এই খবরের সঙ্গে একথাও ছড়িয়ে পড়ল যে মারাঠা দস্যু, তথা বর্গীরা কেবল লুণ্ঠন ও অত্যাচারই করে না, সুযোগ পেলে তারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আটক রেখে অর্থ আদায়ও করে। স্ত্রীলোকমাত্রেই তাদের উপভোগের সামগ্রী। জাতিকুল নির্বিশেষে তাদের ওপর অত্যাচার করা হয় দলবদ্ধভাবে। দেবালয়ে আশ্রয় নিয়েও এই অত্যাচারী দলের হাত থেকে মুক্তি পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। ফলে পলায়ন-পর্ব চলতে থাকল দ্রুত তালেই। মুর্শিদাবাদের মানুষ মালদহ, রামপুর বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে পালাতে লাগল। নবাবও পরিবারবর্গকে পদ্মার পারে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। বন্ধ হয়ে গেল ইউরোপীয় বণিকদেরও ব্যবসা-বাণিজ্য। কাটোয়া ও বর্ধমানের দক্ষিণাঞ্চল লোকাভাবে গভীর জঙ্গলে পরিণত হতে লাগল। হুগলিতেও বর্গীদের একটি প্রধান ঘাঁটি স্থাপন হওয়ায় ভাগীরথীর পশ্চিমপারের মানুষ নিরাপত্তার আশায় কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে এসে বাস করতে লাগল। কলকাতার লোকও ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। ভীতিগ্রস্ত ইংরেজরা সহর সুরক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে দেশীয় বণিকদের সহায়তায় গঙ্গার দিক ছাড়া, সহরের তিন-দিক ঘিরে গড় কাটতে লাগল। এই নালা 'মারাঠা ডিচ' নামে পরি-চিত। কলকাতাকে ঘিরে যার অবস্থান এখনও চোখে পড়ে। এই নালা কাটার কাজে মজুরেরা কোন বেতন নেয়নি, অন্যান্য ব্যয়ও সহরের লোকে চাঁদা করে বহন করেছিল। ইংরেজরা এই সময় সহরের

ইউরোপীয়, আর্মানি ও ফিরিঙ্গিদের নিয়ে ভলান্টিয়ার-সেনাদল গঠন করল।

স্বয়ং নবাব এবং জগৎশেঠ ঢাকায় পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করলেন। সুতরাং সবাই পালাতে লাগলেন। যাঁরা পারলেন না, তাঁরা এক জায়গায় জিনিসপত্র, অন্যত্র পরিবারবর্গ এবং নিজে অন্য এক জায়গায় পলাতক হলেন।

ইংরেজ, ফরাসি আর ওলন্দাজ কুঠির প্রধানরা মিলিত হয়ে যুক্তি করলেন যে, কুঠিরক্ষার আর কোন উপায় নেই। সুতরাং তাঁরা আত্ম-রক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন। তাঁরা স্থির করলেন, শেষরাতে যাত্রা করে তাঁরা পদ্মা নদী পর্যন্ত যাবেন। তিনজন ইউরোপীয় কর্মচারী মোটা অর্থের বিনিময়ে কুঠিরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে থাকতে রাজি হল। সঙ্গে থাকতে রাজি হল পঞ্চাশজন কোম্পানির দেশী পিওন। সাহেবদের এই পলায়নেব বিবরণ তাঁদের নিজেদের লেখা থেকেই পাওয়া যায়:

"যখন আমরা খবর পেলাম যে ৬০০০ মারাঠা অশ্বারোহী কাটোয়ার কাছে ভাগীরথী নদী পার হয়েছে, তখন আমরা আমাদের ঘোড়াগুলিকে আরও একটু তাড়াতাড়ি চালাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। সমস্ত রাস্তা মাঠ দেশ জুড়ে জনস্রোত চলেছে—পুরুষ, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সব মিলে এক বিশাল স্রোত। কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। এই বিরাট জনস্রোতের নদী যেন আর-এক বৃহৎ নদীর (পদ্মার) দিকে প্রবাহিত। যত রকমের যানবাহন আছে সবরকমে চড়ে মানুষ পালাচ্ছে। আমাদের মতো সকলেই প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। সকলে মিলে আমরা একটি পলায়নপর গোষ্ঠী। দ্বিপ্রহর দুটোর সময় আমরা নদীর (পদ্মার) পাড়ে চাঁদপুরে পৌঁছলাম। আমরা স্থির করলাম এখানেই আমরা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব।"[১৯]

কলকাতার কর্তারা কিন্তু এ কাজ বরদাস্ত করলেন না। খবর পাওয়ামাত্র তাঁরা কুঠিতে ফিরে যাবার হুকুমনামা দিয়ে, দ্রুতগতির চাবুক-সওয়ার পাঠালেন পদ্মার পাড়ে। সে চিঠি পেয়ে ইংরেজরা

আবার ফিরে এলেন কাশিমবাজার। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীরাও সকলেই অদৃশ্য হয়েছেন। তাঁদের সকলকেও জমায়েত করবার আদেশ হল। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে সব ব্যবসায়ী যে যার জায়গায় ফিরে এলেন।

ইংরেজদের এই কলকাতা ছেড়ে পালাবার খবর পাওয়া যায় 'মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা' নামক একটি খণ্ডিত পুঁথিতে :

"ফজতুর সেহমান পলায় আর পলায় ফরাস।
এণসাল ওলোন্দাজ পলায় পাইয়া তরাস॥
কলিকাতায় ডিঙ্গিরাজ* পলায় আর পলায় শ্বাস।
বরগিরে দেখিয়া তারা না করে বিশ্বাস॥"[২০]

ইতিমধ্যে বর্ষা নেমে পড়ায়, মারাঠারা কাটোয়ার উত্তরে অজয় নদীর পারে সাঁকাই নামক পল্লীতে এক সুন্দর দুর্গ ও গড়বেষ্টিত ফৌজদারের বাড়ি দখল করে বর্ষা কাটাবার ব্যবস্থা করল। সেখান থেকে তারা মাঝে মাঝে বর্ধমান, হুগলি, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাতে লাগল। কিন্তু অবিলম্বে ঘন বর্ষা নেমে পড়ায় তাদের লুণ্ঠপাটও কমে গেল।

"আসাড় মাসের দেওয়া ঘন বরিসণ।
অজএ ভাসিয়া গঙ্গা ভরিল তখন॥
গঙ্গা ভরিল জদি ইপার উপার।
তবে বরগি লুটীবারে নাহি পাএ আর॥"[২১]

কাজেই ভাস্কর তখন চারদিকে খাজনা আদায় করতে লাগল। এই সময় গ্রামের বড় বড় জমিদাররা বর্গীদের সঙ্গে হাত মেলাতে লাগলেন।

"গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তারা সবে আসি ভাস্করে মিলিল॥"[২২]

---

* ইংরেজ।

এই খবর আমরা অপর একটি খণ্ডিত পুঁথিতেও পাই—এবং এই মিলনের কারণের ইঙ্গিতও সেখানেই রয়েছে।

"কেহ বলে নৈতন ফজদুর আসিছে মোর দেশে।
মিলন করিতে কেহ জায় তার পাশে॥"[২৩]

তাঁদের মনে হয়েছিল মোগল রাজত্বের পতন হবে এবার। আর তার পরিবর্তে হিন্দু রাজত্বের সূচনা হবে। ফলে মারাঠা আক্রমণের খবরে প্রথমদিকে হিন্দু বাঙালিরা আনন্দিতই হয়ে উঠেছিল। গুজব রটল যে, মহারাজ শাহু, নবাব আলিবর্দীকে বরখাস্ত করে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করবেন। সম্ভবত অন্য সকলের সঙ্গে কবি ভারতচন্দ্রও এই গুজবে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই তাঁর রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তিনি সবিস্তারে আলিবর্দী কর্তৃক ভুবনেশ্বরের বৃহদেশ্বর মন্দিরের শিবলিঙ্গ ধ্বংসের বর্ণনা করলেন।

"বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বর করিলেন ধূম॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গাসহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল।
মারিতে লইয়া হাতে প্রলয়ের শূল।
করিতে যবন সব সমূলে নির্ম্মূল॥
নিষেধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে।
বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে॥
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর।
না ছাড় সংহার শূল সংহর সংহর॥
আছএ বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥

সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিল স্বপন ॥"[২৪]

ভারতচন্দ্রের মতে তাই, মহারাজ শাহু যে মহাদেবের স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আলিবর্দীকে দমন করতে এক বিশাল বর্গীর বাহিনী বাংলায় পাঠালেন তা আলিবর্দীর স্বকৃত পাপেরই ফলস্বরূপ।

"স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইয়া রঘু রাজা ভাস্কর পণ্ডিত ॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি-আকৃতি ॥
লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥
লুটিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী ॥"[২৫]

ভারতচন্দ্রের বর্গীর হাঙ্গামার বর্ণনা পড়লে মনে হয়, নদীয়াতে, বিশেষ করে কৃষ্ণনগরে বর্গীর হাঙ্গামা তত তীব্র আকার কখনই ধারণ করেনি। যেটুকু বর্ণনা রয়েছে, তা পারিপার্শ্বিক অবস্থারই প্রভাব বলে মনে হয়। হয়তো এমনও হতে পারে, যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে শাহু রাজার কোনপ্রকার চুক্তি সাধিত হয়েছিল। হয়তো সেই কারণে কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত এলাকায় বর্গী প্রবেশ করেনি। এবং সেই কারণেই ভারত-চন্দ্রের রচনায় বর্গীর অত্যাচারের তীব্রতা মোটেই প্রকাশ পায়নি। যেন লোকপরম্পরায় শোনা কাহিনীই কবি তাঁর কাব্যে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্গীদের আক্রমণের বীভৎস চেহারার যে বর্ণনা গঙ্গা-রামের কাব্যে বা বাণেশ্বরের কাব্যে পাই সেটাই যে সত্য ঘটনা

তার সমর্থন মেলে কোম্পানির রিপোর্ট ও চিঠিপত্রে।

যাই হোক, বর্গীর হাঙ্গামার পর কাশিমবাজার এবং তার পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চল জুড়ে আইন-শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়ে। এমনকি রাজ-ধানী মুর্শিদাবাদেও একই অবস্থা। মারাঠাদের অত্যাচার-অনাচারের স্মৃতি মানুষের হৃৎকম্পের সৃষ্টি করল। দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁদের পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ রক্ষার জন্য গঙ্গার পূর্বদিকে দলে দলে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলেন। স্বয়ং নবাব ও তাঁর ভাই হাজি আহম্মদও পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ ঢাকায় স্থানান্তরিত করে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে নিজেরা প্রস্তুত রইলেন, মারাঠাদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য।

এদিকে বর্গীরা কাটোয়ায় পালিয়ে গিয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে জুলুম করে চৌথ আদায় করতে লাগল এবং বহু নৌকা লুঠপাট করতে শুরু করল।

"বড় বড় নৌকা জেখানে জত ছিল।
বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল॥"[২৬]

উদ্দেশ্য কাটোয়ার ঘাটে নৌকাগুলিকে পর পর সংযুক্ত করে সেতুর কাজে লাগানো, লুণ্ঠনের কাজের সুবিধার জন্য।

"ইপারে উপারে লাহাস দিল তালাইয়া।
নৌকা সব তার মধ্যে রাখে বান্ধিয়া॥
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস।
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন ফরাস॥
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইছাএ পাইছাএ মাটী ফেলিতে লাগিল॥
মাটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর॥
ডাঞিহাটের ঘাটে জদি পূল বাধা গেল॥
কত সত বরগি তারা লুটিতে চলিল॥"[২৭]

নদীর ওপরে নৌকাগুলিকে পর পর দাঁড় করিয়ে সেতুর মত করা হল।

তারপর আশপাশের গ্রাম থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে নৌকার ওপর বিছিয়ে দিয়ে তার ওপরে ঘাস মাটি ফেলে মসৃণ পথের আকার দেওয়া হল। তখন সেই সেতুর ওপর দিয়ে ঘোড়া-চলাচলেও কোন অসুবিধে রইল না। এই সেতু পার হয়ে বর্গীদের লুণ্ঠন চলল অবাধে।

সুতরাং যুদ্ধ চলতেই থাকে। কখনও নবাব সেনা পিছিয়ে আসে, কখনও বা বর্গীর দল।

"ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল॥
তবে বরগি পিঠ দিয়া সিগ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ॥
পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল।
নবাব সাহেবের নাম সুইনা উমনি পলাইল॥
সিগ্রগতি আসি বরগি পূলে পার হইল।
পার হইঞা পূল তবে কাটঞাত ছিল॥"[২৮]

ইতিমধ্যে আশ্বিন মাস এসে যায়। ভাস্কর পণ্ডিত গ্রামের লোকের সহায়তায় দুর্গাপূজার আয়োজন করে, কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটে। আর বিহার থেকে নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দিন সসৈন্যে যোগ দিলেন নবাবের সঙ্গে। নবাবী সেনা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে রাত্রিকালে নৌসেতু করে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ায় পৌঁছায়। নবাব-জামাতা জৈনুদ্দিন নবাবকে পরামর্শ দেন, পূজা শেষ হবার পূর্বেই মারাঠা বাহিনীকে আক্রমণ করতে। কারণ পূজার পরে চারদিকের জলকাদা শুকিয়ে গেলে বর্গীদের সুবিধে হবে। তখন তাদের পরাজিত করা কঠিন হবে।

"তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে।
পূজা না হৈতে আগে মার ভাস্করকে॥
নবাব বোলে আগে দসরা জাউক।
চাইর দিগে জল কাদা সকলি ষুকাউক॥

এত জদি নবাব বুলিলা তার তরে।
জয়ন্দি আহাম্মদ খা বোলে নবাবেরে॥
জল কাদা শুখাইলে বরগির হবে বল।
চতুদিগে লুটিবে পোড়াবে সকল॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকাএ করিয়া।
রাতারাতী জেন বরগি মারে গিয়া॥[২৯]

সুতরাং ভাস্করের পূজা অসমাপ্তই থেকে যায়। কারণ নবমীর দিন আলিবর্দী খান অতর্কিতে বর্গীর দলকে আক্রমণ করেন। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি দুর্গোৎসব-শ্রান্ত নিশ্চিন্ত মারাঠাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে আলিবর্দী তাদের কাটোয়া-ছাড়া করেন। তারা লুঠের মাল ফেলে দিয়ে, কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টামাত্র না করে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে যায়।

"এক এক ঘোড়াএ দুই দুই বরগি চড়িয়া।
দব্য সামগ্রি কত জাএ ফেলাইয়া॥
সপ্তমি অষ্টমি দুই পূজা করি।
ভাস্কর পলাইয়া জাএ প্রতিমা ছাড়ি॥
মিষ্টান্ন সামগ্রি জত ছিল কাছে।
বহুনিয়া লুটিতে লাগিল তার পাছে॥"[৩০]

পরে পরাজিত ও পলায়মান বাহিনীর পিছু ধাওয়া ক'রে, নবাব তাদের তাড়িয়ে দেন ওড়িশার চিল্‌কা হ্রদের ওপারে। এই সময় বর্গী-বিতাড়নে নবাবকে সাহায্য করেন বীরভূম ও বর্ধমানের জমিদারদ্বয়।

বীরভূমের জমিদার বাদি-উজ-জামান খাঁ ও তাঁর ভাই আলি নকি খাঁ নবাবকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সর্বৈবভাবে। সৈন্য ও রসদের যোগান তো দিয়েছিলেনই, সেইসঙ্গে জেলাকে মারাঠা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে, বিশেষ কিছু কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন চৌকির প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করলেন, রাজধানী রাজনগরের ঘন বনের মধ্যে একটি মাটির গড় তৈরি করলেন,

আর তৈরি করলেন রাজধানী ঘিরে বত্রিশ মাইল দীর্ঘ ও আঠারো ফুট উঁচু একটি প্রাচীর, যার বাইরে তৈরি হল এক গভীর পরিখা। এ-ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আরও কয়েকটি গড় ও প্রাকার প্রস্তুত করা হল। প্রতিটি গড়ে উপযুক্ত পাইকের প্রহরারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রচুর ব্যয় ও প্রচুরতর পরিশ্রমে প্রস্তুত এই কর্মযজ্ঞে পরিকল্পনাগত মারাত্মক কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। উক্ত নগরপ্রাচীরটি পূর্ব-পশ্চিমে যতটা উঁচু ছিল, উত্তর-দক্ষিণে ততটা না থাকায় পশ্চিমের অরণ্যপথ দিয়ে জেলায় প্রবেশ করে সামান্য একটু ঘুরে উত্তর বা দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রাচীর ডিঙিয়ে নগরে প্রবেশ করা অভিজ্ঞ অশ্বারোহী মারাঠা-দস্যুর পক্ষে মোটেই দুঃসাধ্য ছিল না। এবং খুব শীঘ্রই তা প্রমাণিত হল।

এদিকে সুবা বাংলার নিয়ন্ত্রণ ও চৌথ আদায়ের অধিকার নিয়ে রঘুজী ও বালাজী বাজীরাওয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তখন চরমে উঠেছে। সে অধিকার কায়েম করতে দু'জনেই বদ্ধপরিকর। ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে মেদিনীপুরে ঢুকলেন রঘুজী ভোঁসলে। গন্তব্যস্থল মুর্শিদাবাদ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়াও ঝাড়খণ্ডের পাহাড়-জঙ্গলের দুর্গম অথচ সংক্ষিপ্ততম পথ দিয়ে বীরভূমে এসে, বীরভূম-রাজের দুর্গম প্রাচীর হেলায় অতিক্রম করে, বিশাল বর্গীবাহিনী নিয়ে এসে পৌছলেন রাজনগরের ভিতর দিয়ে বীরভূমে। এঁরও লক্ষ্যস্থল রাজধানী মুর্শিদাবাদ। জেলার একচ্ছত্র জমিদার বাদি-উজ-জামান ও তাঁর ভাই আলি নকি খাঁ প্রথমদিকে বর্গী-বিরোধী সংগ্রামে সামিল হলেও, পরে আত্মরক্ষার তাগিদে হানাদারদের সক্রিয় সহযোগী অথবা উপযুক্ত উপঢৌকনের বিনিময়ে অনুকম্পা ও আশ্রয় লাভ করে, তাদের অপকর্মের নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এই সময় তাঁদের আর কোনরকম পাত্তা পাওয়া যায়নি।

এই সময় জগৎশেঠ হলেন সপরিবারে ঢাকায় প্রথম পলাতক। কিন্তু এইভাবে তো বেশিদিন চলতে পারে না। তাই বর্গীর একটা দলকে অর্থ

দিয়ে সন্তুষ্ট করে, তার সাহায্যে অন্য দলকে পরাস্ত করবার পরিকল্পনা করলেন নবাব আলিবর্দী। ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বহরমপুরের থেকে মাইল দশেক দূরে চৌরিয়াগাছিতে (বর্তমান নাম সারিগাছি) নবাবের সঙ্গে মারাঠা নায়ক পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে দু'জনের চুক্তি হল রঘুজীর বিরুদ্ধে। স্থির হল, নবাব বার্ষিক ২২ লক্ষ টাকা তুলে দেবেন পেশোয়ার হাতে। পরিবর্তে পেশোয়াকে তাঁর প্রতিপক্ষ অপর মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলেকে দমন করতে হবে। আর তাঁর দল আর ভবিষ্যতে কখনও বাংলা সুবায় অত্যাচার করবে না। বাজীরাও এই শর্তে রাজি হয়ে নবাবের সঙ্গে মিলিত আক্রমণে ভোঁসলের বাহিনীকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হলেন।

রঘুজী ভোঁসলে ও ভাস্কর পণ্ডিত তখন কাটোয়ার ঘাঁটিতে ছিলেন। নবাবের সঙ্গে পেশোয়ার চুক্তির খবর সেখানে পৌঁছতে দেরি হল না। সমূহ বিপদ দেখে ভোঁসলে তাঁর বাহিনী নিয়ে কাটোয়া ছেড়ে গিয়ে তাঁবু ফেললেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান বীরভূমে। মাত্র কিছুদিন আগেই পেশোয়ার নেতৃত্বে একদল বর্গী বীরভূমের ভিতর দিয়ে চলে গেছে, দু'পাশের গ্রামগুলিতে ধ্বংস আর মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়াতে ছড়াতে। এবারে অপর এক দল এসে সেই একই হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার আর অগ্নিসংযোগের পুনরাবৃত্তি শুরু করে দেয়। অবশ্য এই অবস্থা বেশিদিন চলেনি। অল্প সময়ের মধ্যেই পেশোয়া ও নবাবের মিলিত আক্রমণ ভোঁসলের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। হতাহত অনুচর ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের বোঝা পিছনে ফেলে পশ্চিমের দুর্গম পথ দিয়ে ভোঁসলের দল একেবারে বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর ধাবমান বর্গীর দলের পথের দু'ধার দলিত-মথিত মানুষের কান্নায় ও হাহাকারে ভরে ওঠে। তবু ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এই মাত্র নয় মাসের ক্ষণস্থায়ী শান্তি বাংলায় বজায় ছিল।

পেশোয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রঘুজী ভোঁসলে পালিয়ে

গেলেন বটে, কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফললাভ হল না। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে মারাঠারা আবার এল।

"আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্রমাসে পুণরূপি আইল সাজিয়া॥"[২১]

এক দল নয়, দু'টি অত্যাচারী মারাঠা দলই তাদের বাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হল। সম্ভবত ইতিমধ্যে রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে বাজীরাওয়ের একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। যার ফলে নবাবের সঙ্গে পূর্ব-সন্ধির শর্তগুলি আর মানবার প্রয়োজন বোধ হল না। বিপদ বুঝে নবাব আর সন্ধি বা অর্থদানের পথে ভরসা না রেখে, আত্মরক্ষার জন্য অন্য উপায় চিন্তা করলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ২২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি একটির জায়গায় দু'টি লুণ্ঠনকারী মারাঠা বাহিনীর সম্মুখে লুণ্ঠন ও হত্যার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

বর্গীদের এবারের আগমনের উদ্দেশ্য চৌথ আদায় নয়। লুণ্ঠনে উপার্জন। তাই রঘুজীর প্রতিনিধি ভাস্কর পণ্ডিত বেশি অগ্রসর না হয়ে বাংলার নানা স্থানে লুণ্ঠন চালিয়ে যেতে লাগল। যেহেতু সে যুদ্ধ করতে চায় না, তাই এক জায়গায় তাড়া দিলে, অন্য জায়গায় সরে গিয়ে লুণ্ঠন চালায়। এবারে হত্যার পরিমাণও বাড়িয়ে দিল। এবারেও ছাউনি করল কাটোয়াতেই। এতে নবাব বিপন্ন ও হতাশ হয়ে পড়লেন। সুতরাং মন্ত্রী-পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ হল। দেওয়ান ও প্রধান সচিব জানকীরাম (ইনি মহারাজা দুর্লভরামের পিতা ও রাজা রাজবল্লভের পিতামহ) এক চমৎকার বুদ্ধি দিলেন। তাঁদের পরামর্শমত নবাব ভাস্করের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী নবাবের কারুকার্য-খচিত তাঁবু পড়ল গঙ্গার পাড়ে, মানকর পরগনায়। এইখানেই নবাবের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য আসবে ভাস্কররাম কোলাহাতকার—বর্গীর সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত নামেই যে সুপরিচিত। সঙ্গে নিয়ে আসবে মাত্র বাইশজন মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ। ভাস্করের মনে-মনে আশা ছিল গতবছর পেশোয়াকে যেভাবে নবাব বাইশ লক্ষ টাকা

দিয়ে তুষ্ট করেছিলেন, এবারে তাকেও নিশ্চয়ই সেইভাবেই সন্তুষ্ট করবেন। টাকা-পয়সার ব্যাপারে মারাঠারা একে অপরকে বিশ্বাস করতে চায় না। তাই পাছে ভাস্কর উৎকোচের অর্থ বেশির ভাগই নিজে আত্মসাৎ করে, তাই প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষরা প্রায় সকলেই তার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে এসেছিল। তারা সংখ্যায় ছিল বাইশ জন। নবাবের নির্দেশানুসারে জানকীরাম কৌশলে ভাস্করকে নবাবের মানকরার শিবিরে নিয়ে এলেন।

"তুসরাগ্রি বৈসাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে॥
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য গুইলা গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল॥"[৩২]

বৈশাখ মাসের তু'তারিখে শনিবার ভাস্করকে কৌশল করে আনা হল নবাবের তাঁবুতে। বিধাতা বিমুখ হওয়ায় তারও বুদ্ধিনাশ হল, হাতিয়ার ছাড়াই সে নবাবের সঙ্গে মিলিত হতে এল।

ভাস্করকে খতম করবার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল মীরজাফরের উপর। এই হত্যালীলার নায়ক মীরজাফর তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে পেয়েছিলেন মীরকাশিম নামে এক সাহসী তরুণ যুবককে, যে নিজের হাতে মারাঠা-তুঃস্বপ্নকে বাংলা থেকে মুছে দিতে এগিয়ে এসেছিল। এই মানকর শিবিরের বর্ণনা মুসলমানী এবং মারাঠা ইতিহাসে অপূর্ব নাটকীয় ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে। ভাস্করের সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন নবাব একবার "খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি" (একটু বাইরে থেকে আসি) বলে শিবির ত্যাগ করেন। নবাবের প্রত্যা-বর্তনের জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভাস্করও 'স্নান পূজা' সমাপ্ত করতে উঠে পড়ল। ঠিক সেই সময়ে নবাব-দরবারে লুক্কায়িত সেনারা তাকে অতর্কিতে আক্রমণ ও হত্যা করে।

"জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তলআর খুলিয়া তখন মারিলেক তাখে॥"[৩৩]

বাইরে ভাস্করের অনুচর, মহারাষ্ট্র সেনাদল, অপেক্ষা করছিল। তারা নবাবী সেনা দ্বারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হল। কিছু মরল, কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচল। কবি গঙ্গারামের বর্ণনা অনুযায়ী অবশ্য সকলেই মারা গিয়েছিল। আর মানকরের শিবিরে যেইমাত্র সপার্ষদ ভাস্কর পণ্ডিত মারা গেল, সেই ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ মনস্থুরা নামক জনৈক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কবি গঙ্গারামকে এসে দিয়েছিল।

"সেই ক্ষণে তবে খটাবট্টি হইল।
জতগুলা আইসাছিল সবগুলা মইল॥
...মানকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল।
মনস্থুরা দউড়াইয়া কবি গঙ্গারামে কইল॥"[৩৪]

এই ঘটনার পর বর্গীরা বছরখানেক হাঙ্গামা বন্ধ রাখে। কিন্তু তারপর হাঙ্গামা আবার শুরু হয়। শেষপর্যন্ত নবাব আলিবর্দী খাঁ বর্গীদের সঙ্গে আর পেরে না ওঠায়, সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী আলিবর্দী উড়িষ্যা বর্গীদের হাতে তুলে দেন। আর মারাঠারা পরিবর্তে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা উড়িষ্যা থেকে সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে বাংলায় আর কখনও ঢুকবে না। জলেশ্বরের কাছে, সুবর্ণরেখার পূর্বতীর পর্যন্ত আলিবর্দী খাঁর রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হয়। আলিবর্দী প্রতিবছর বাংলার চৌথ হিসেবে ১২ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। সুতরাং উড়িষ্যা প্রদেশ ও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথদানের বিনিময়ে নবাব বাংলায় বর্গীর উপদ্রব সম্পূর্ণ নিরসন করলেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের বর্গীর হাঙ্গামার বর্ণনার চেয়ে গঙ্গারামের ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের বর্ণনায় এই অত্যাচারের তীব্রতা অনেক বেশি প্রকাশ পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে মনে হয়, একাদিক্রমে পর পর আট-নয় বছর আক্রমণ-অভিযান চালিয়ে মারাঠাদের নির্যাতন-ধারা বহুগুণে কঠোরতর হয়েছিল। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এ-বিষয়ে তারা নিপুণতা অর্জন করেছিল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে।

উড়িষ্যা-প্রাপ্তির ফলে মারাঠা রাজ্য আরব সাগর থেকে বঙ্গোপ-সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হল। মারাঠাদের ক্ষমতা এই সময়ে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের এই লুণ্ঠকের ভূমিকায় বিচরণ, সকলকে ভুলতে বাধ্য করল যে, একসময় তাদের রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানো। কিন্তু তার পরিবর্তে সারাভারত জুড়ে মারাঠা শক্তি শুধু-মাত্র দস্যুতায় সকলের কাছ থেকে কলঙ্ক কুড়োল। তারপর ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তি যখন আহমদ শাহ্ আবদালীর কাছে নিদারুণ পরাজয় স্বীকার করে নিল, তখন তাদের সেই ধ্বংসে সাধারণ মানুষ মোটেই দুঃখিত হয়নি। তাদের কাছে সেটা মারাঠাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলেই মনে হয়েছিল।

গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গীর হাঙ্গামার যে ভয়াবহ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা সমগ্র রাঢ়-বঙ্গ সম্পর্কেই সত্য। বস্তুত নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কেউই রক্ষা পায়নি তাদের নৃশংস উৎপীড়ন-অত্যা-চারের হাত থেকে। বিভিন্ন সময়ে তাদের যাতায়াতের পথের দু'ধারে ঘোড়ার পিঠে যতদূর যাওয়া যায় সর্বত্রই চলেছিল তাদের হানাদারি। বর্গীদের উৎপাতে রাজনগর থেকে মুর্শিদাবাদ বা বর্ধমানগামী পথের দু'পাশের গ্রাম ও জনজীবন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল অজয়-ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী বহু সমৃদ্ধ হাট-বাজার-গঞ্জ। পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে মানুষ যে যেদিকে পারে পালিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। সে আশ্রয় হতে পারে পার্শ্ব-বর্তী নিরাপদ জেলা, হতে পারে সেই জেলারই কোন দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেখানে বর্গীরা পৌঁছতে পারবে না। কৃষকেরা ছন্নছাড়া পলাতক বলে চাষের খেত পড়ে থেকেছে অনাবাদী হয়ে। স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁতীর তাঁত। মানুষ পথে বেরোত প্রাণ হাতে করে। পুঁথিসহ জনৈক পুরুষোত্তম বিদ্যালংকার মহাশয়ের নিরাপদে পলায়ন সংবাদ পেয়ে

চিঠি লিখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন তাঁর এক শিষ্য বীরভূম জেলাবাসী শ্রীবৃন্দাবনবিহারী—

"...সাবধানে জ্ঞাত হইলাঙ আপনে নিরুদ্বেগে পার হইয়াছেন এ সম্বাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাঙ বরগীর সম্বাদ সম্প্রতি নিষ্কর্ষ লেখা জায় না চৈত্রের পর নিশ্চয় সম্বাদ লিখিব..."[৩৫] ইত্যাদি।

এইরকমই অপর একটি প্রাচীন পত্র অনুসারে সে সময় কত যে জরুরী "সনন্দ বর্গীর হাঙ্গামে খোওয়া গীএ়াছে"[৩৬] তার কোন হিসেবই নেই।

বর্গীরা গ্রামের পরে গ্রাম কিভাবে লুঠপাট করেছে, কিভাবে এক-একটি গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারে ঢুকে, তাদের বাড়ির লোকজনকে হত্যা করে, কোন কোন লোককে প্রহার করে, বাড়ির যথাসর্বস্ব লুঠপাট করে নিয়ে গিয়েছে, তার এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে লিপিকৃত মহাভারতের একটি পুঁথির পাতায়। সেখানে বলা হয়েছে "সন ১১৫২ সালে মাহ ৬ ছউই জ্যৈষ্ঠে সোমবারে ফরাষ-ডাঙ্গার বাগবাজার বরগিতে লুঠ করিয়া লইয়া গেল এবং সোনাবামনির ভাতারকে খুন করিয়া গেল রামচন্দ্র ষুরের সর্ব্বস্ব লইয়া গেল ষুরের পিতা ও জামাতা ও নফর ও বৈবাহিক শ্রীসহস্ররাম নিয়োগীকে প্রহার করিয়া গেল"।[৩৭] পুঁথিটির ১৪৮ক সংখ্যক পত্রে এই পাঁচ লাইনের বিবরণটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা প্রত্যক্ষদর্শী লিপিকরের এই সংক্ষিপ্ত অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দুর্লভ ঐতিহাসিক রিপোর্টের চেয়েও মূল্যবান।

এ ছাড়া, সাম্প্রতিকতম কালে আবিষ্কৃত বারাসত থেকে ব্যারাকপুর যাবার পথে অবস্থিত সাঁইবনা নামক গ্রাম থেকে সংগৃহীত ৬৫ সে. মি. × ৪০ সে.মি. আকারের শিলালিপিটিতে উৎকীর্ণ রয়েছে আঠারো শতকের বাংলার দু'টি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ : (১) বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণ, (২) বর্গীর হাঙ্গামা। আলোচ্য শিলালিপিটি প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা। বর্গীর হাঙ্গামা

সম্পর্কে এখানে লেখা রয়েছে "...বরগি ১১৪৮ সনে চৈত্রে"।[৩৮]

এই বর্গীর হাঙ্গামা সম্পর্কে বীরভূম জেলায় কিছু কিছু কিংবদন্তি পাওয়া যায়। সেই কিংবদন্তি অনুসারে বর্গীর হাঙ্গামার সময় বীরভূম জেলার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বর্গীদের লোভ আর হিংসার যূপকাষ্ঠে ভীরুর মত শুধুই আত্মসমর্পণ বা আত্মরক্ষার্থে পলায়নের পরিবর্তে, কিছু কিছু প্রতিরোধের খবরও পাওয়া যায়। আর এই প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল একান্তভাবেই সাধারণ মানুষদের পক্ষ থেকে।

বীরভূম জেলার এই গণ-প্রতিরোধের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল সুপুর গ্রাম। এই প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম সুপুর তখন ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত অত্যন্ত সুরক্ষিত, প্রায় দুর্গের সমানই একটি গ্রাম। সে প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ কিছুকাল আগেও সুপুর গ্রামে গেলে দেখতে পাওয়া যেত। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বীরভূম জেলা ছিল বর্গীদের যাতায়াতের পথে অবস্থিত। তাই বারবার সে গ্রাম বর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, আর ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত সমস্ত রকমের কুফলই ভোগ করতে হয়েছে এই জেলাটিকে। বীরভূমের অন্যান্য গ্রামগঞ্জের মত বর্গীরা সুপুর গ্রামও আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে বারবার। ফলে একদিন এই গ্রামের মানুষ রুখে দাঁড়াল হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রাণের দায়ে।

ঘনবসতিপূর্ণ এই গ্রামের প্রধান বাসিন্দা ছিল নীচু জাতির রুক্ষ তেজী বলিষ্ঠ মানুষেরা। এ ছাড়া ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ। হিন্দুরা ছিল বৈষ্ণবপ্রধান। এই বৈষ্ণবদের মধ্যে আনন্দচাঁদ গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী। তিনিই সেদিনকার সেই বর্গীদের বিরুদ্ধে মারমুখী জনতাকে নেতৃত্বদান করেছিলেন ও তাদের সংগঠিত করবার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে। ফলে আনন্দচাঁদের গৃহাশ্রম দেখতে দেখতে বর্গী-প্রতিরোধের এক সক্রিয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সেখানেই চলতে থাকে শত্রুদের উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা ও পরামর্শ। শত শত গ্রাম-

বাসী, যাদের অগ্রণী ছিল তথাকথিত নিম্নবিত্তের মানুষ—মাল-বাগদী-ডোমেরা, তাদের সুলভ হাতিয়ার সড়কি, বল্লম, বাঁশের শক্ত লাঠি আর মশাল নিয়ে একদিন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাত্রির অন্ধকারে বর্গীদের ছাউনিতে। প্রথমে তারা মারাঠাদের তেজী ঘোড়াগুলোকে জখম করে দেয়, পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারাঠাদের ওপর। মারাঠারা এই আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত ঘোড়াগুলি জখম হওয়ায় তারা পালাতেও পারে না। তাই হতচকিত মারাঠারা অনন্যোপায় হয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে চায়। আলোচনা হল আনন্দচাঁদের সঙ্গে। স্থির হল বর্গীরা অবিলম্বে সুপুরের ছাউনি তুলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। তাই হল। বর্গীরা সুপুর ছেড়ে পালাল। এরপরে সুপুরে আর কখনও বর্গীর হাঙ্গামা হয়নি।

সুপুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত এই কিংবদন্তি থেকে ইতিহাসের যে নির্যাসটুকু পাওয়া যায়, তা হল—আনন্দচাঁদ গোস্বামীর নেতৃত্বে সুপুর-বাসীরা বর্গী-আক্রমণের প্রতিরোধ করেছিল প্রবলভাবে।

বীরভূমের দ্বিতীয় প্রতিরোধটি গড়ে উঠেছিল ইটণ্ডা গ্রামে। ইটণ্ডা তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রাম। জমজমাট ব্যবসা-কেন্দ্র। কাটোয়া থেকে অজয় নদীর পথে নৌকা করে ব্যবসায়ীরা আসত হরেকরকমের সওদা নিয়ে। সারাদিন ইটণ্ডার হাটে হাটে মাল বিক্রি করে, যাবার পথে নৌকা ভরে নিয়ে যেত এখানকার গ্রামে গঞ্জে প্রস্তুত রেশম, তসর, গড়া কাপড়, কাঁসার বাসন, লোহার কড়া, হাতা ইত্যাদি। আর নিয়ে যেত ইটণ্ডার বিখ্যাত গালার তৈরি নানান শৌখিন জিনিস, যার সুনাম পৌঁছেছিল বাংলার সর্বত্র।

কিন্তু বর্গীদের উৎপাতে ইটণ্ডার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় গ্রামীণ শিল্প-তৈরি। লুণ্ঠিত হয় পসারীদের পণ্যসম্ভার। স্তব্ধ হয়ে যায় কর্মচঞ্চল গ্রামের প্রাণস্পন্দন।

এমন অবস্থায় ইটণ্ডার গ্রামবাসীদের বর্গীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে

সাহস ও নেতৃত্বদান করলেন এ গ্রামেরই জোড়াল খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি, স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গেও ছিল যাঁর গভীর সদ্ভাব।

প্রতিরোধের প্রথম পর্বে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় গ্রামে তৈরি হল প্রকাণ্ড একটি মাটির গড়। বর্গীদের আগমন-বার্তা পেলেই গ্রামের সকলে ঘরবাড়ি ছেড়ে সেই গড়ে আশ্রয়গ্রহণ করত, উপযুক্ত রসদ নিয়ে। আর নিত টাকাকড়ি। আর বর্গীরাও মনের আনন্দে লুঠপাট করে চলে যেত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে গ্রামবাসী প্রাণে বাঁচলেও ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে উঠতে লাগল। সুতরাং এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। তাই বর্গীদের মুখোমুখী হয়ে প্রতিরোধের পরিকল্পনা করলেন জোড়াল খাঁ। সেইমত প্রস্তুতি চলতে থাকে। ব্যতিক্রম দেখা দিল অন্যান্যবারের বর্গী-আক্রমণের সঙ্গে। বর্গীরা এবারে এসে প্রবল বাধার সম্মুখীন হল। সমস্ত গ্রামবাসী লাঠি-সড়কি-বল্লম নিয়ে জোড়াল খাঁর পরিচালনায় প্রবলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র বর্গীর দলের ওপর। এক্ষেত্রেও বর্গীরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তীব্র আক্রমণের মুখে পড়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা দ্রুত পালাল। এরপর থেকে বর্গীরা আর ইটণ্ডা গ্রামে বিশেষ হাঙ্গামা করেনি। ইটণ্ডা গ্রামে সেই গড়ের ভগ্নচিহ্ন আজও খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

ইটণ্ডা গ্রামের বর্গী-প্রতিরোধের এই কিংবদন্তি থেকেও অন্তত এইটুকু ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণ করা চলে যে, এই গ্রামের জনগণ বর্গীর হাঙ্গামার মুখে নিজেদের ভীরুর মত ছেড়ে দেয়নি অথবা ধন-প্রাণ নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টাও করেনি। তারা তাদের সামর্থ্যমত রুখে দাঁড়িয়েছিল বর্গীর বিরুদ্ধে। আর এইক্ষেত্রে তাদের সাহস ও বুদ্ধি দিয়েছিলেন জোড়াল খাঁ নামক কোন জনপ্রিয় পাঠান।

কিছুকাল আগেও যে মহারাষ্ট্রের নামটি সাধারণ বাঙালির অজানা ছিল, এখন তা ঘরে ঘরে আতঙ্কের সঙ্গে উচ্চারিত হতে লাগল। বাংলার কোন প্রত্যন্ত গ্রামেও এমন কোন মানুষ আর রইল না, যে বর্গীর

নাম শোনেনি, শোনেনি তাদের কীর্তিকলাপ। বাংলার ছড়ায়, গাথায়, ঘুমপাড়ানি গানেও বর্গীরা জুড়ে বসল।

"ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়োল, বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে॥"

—এ গান দু'শো বছর পরে আজকেও কোন শিশুর অজানা নেই। যদিও আজ তা শুধুই ছড়ার-গল্পের সামগ্রী।

বর্গীর হাঙ্গামার বিভীষিকা একদিন বাংলার বুক থেকে মিলিয়ে যায়। বদ্ধ জলার মত নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা সমাজে আবার প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়। চাষী আবার চাষ শুরু করে। স্তব্ধ তাঁতের চলার আওয়াজ আবার পাওয়া যায়। বন্ধ পরিত্যক্ত আড়ংগুলোয় আবার বাড়তে থাকে ব্যাপারীদের ভিড়। বণিকেরা আবার নদীতে নৌকা ভাসায়। কিন্তু গভীর ক্ষতচিহ্নগুলো অত দ্রুত শুকোয় না। লোক আর সম্পদক্ষয়ের ছাপ পড়ে চাষে, শিল্পে, আর বাংলার ভঙ্গুর অর্থনীতিতে। দেশ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথেই এগিয়ে চলে। বর্গীদের হাঙ্গামার ফলে দেশের যে এক বিশাল অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছিল, যে কৃষিক্ষেত্র আর লোকালয় একাকার হয়ে শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ ফল পড়েছিল বাংলার অর্থনীতির ওপর। আলিবর্দী খাঁ অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসক হয়েও বর্গীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, ন্যুব্জদেহ, নিঃস্ব মানুষদের করভারে জর্জরিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর এই ভঙ্গুর অর্থনীতি ধীরে ধীরে ডেকে এনেছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে।

তথ্যসূত্র

১. 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান'—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩৬২-৬৩।

২. 'চিত্রচম্পূ কাব্য'—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। আলোচ্য কাব্যখানিতে যে বর্গীর হাঙ্গামার বর্ণনা রয়েছে, সে-সম্পর্কে প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন অধ্যাপক পণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ১৩৩৫ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। পুঁথিটির খণ্ডিত অংশ বর্তমানে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।

৩. 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'—গঙ্গারাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ১৭৮৪।

৪. ঐ। পত্রসংখ্যা ১।

৫. ঐ। পত্রসংখ্যা ২ক।

৬. ঐ। ঐ।

৭. ঐ। পত্রসংখ্যা ২খ।

৮. ঐ। পত্রসংখ্যা ৩ক।

৯. ঐ। পত্রসংখ্যা ৩খ।

১০. ঐ। পত্রসংখ্যা ৪খ।

১১. ঐ। ঐ।

১২. ঐ। ঐ।

১৩. ঐ। ঐ।

১৪. ঐ। পত্রসংখ্যা ৩খ।

১৫. ঐ। পত্রসংখ্যা ৩খ-৪ক।

১৬. ঐ। পত্রসংখ্যা ৪ক।

১৭. ঐ। ঐ।

১৮. ঐ। ঐ।

১৯. Factory Records of Kashimbazar, Vol. 6.

২০. 'মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা', বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ১৮৭২।

২১. 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'—গঙ্গারাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ১৭৮৪। পত্রসংখ্যা ৪খ।

২২. ঐ। ঐ।

২৩. 'মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা', বিশ্বভারতী পুঁথিসংখ্যা ১৮৭২।

২৪. 'অন্নদামঙ্গল'—ভারতচন্দ্র রায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ, পৃ ৭৯।

২৫. ঐ। ঐ।

২৬. 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'—গঙ্গারাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ১৭৮৪। পত্রসংখ্যা ৪খ।

২৭. ঐ। পত্রসংখ্যা ৪খ-৫ক।

২৮. ঐ। পত্রসংখ্যা ৫ক।

২৯. ঐ। পত্রসংখ্যা ৫খ।

৩০. ঐ। ঐ।

৩১. ঐ। পত্রসংখ্যা ৬ক।

৩২. ঐ। পত্রসংখ্যা ৬খ।

৩৩. ঐ। ঐ।

৩৪. ঐ। ঐ।

৩৫. বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত একটি পত্র থেকে উদ্ধৃত।

৩৬. ঐ।

৩৭. পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের জাতীয় অভিলেখাগারে (Arquivo Nacional da Torre do Tombo) সংরক্ষিত মহাভারতের একটি পুঁথি। এ-সম্পর্কে সম্প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ৫ জুলাই ১৯৮৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় লেখা "ইতি-হাসের টুকরো" নামক প্রবন্ধে। যদিও সেখানে তিনি পুঁথির যে পাঠ গ্রহণ করেছেন আমরা তার সঙ্গে একমত নই। আমরা আমাদের অনুমিত পাঠটিই এখানে উদ্ধৃত করেছি।

৩৮. ২৪ আগস্ট ১৯৮৬ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত শ্যামলকান্তি চক্রবর্তীর "সিরাজের কলকাতা লুণ্ঠন : পাথুরে প্রমাণ" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বর্গীর হাঙ্গামার ক্ষত ভাল করে শুকোবার আগেই সুবা বাংলা জড়িয়ে পড়ল এক তীব্র জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একটার পর একটা গুরুতর রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে যায় দ্রুত লয়ে। সিরাজউদ্দৌলার মসনদে আরোহণ, ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে কলকাতা জয়, সেই ঐতিহাসিক পলাশীর প্রান্তর, তারপর দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের হাত থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানিলাভ। অর্থাৎ পরাভূত, আশ্রিত, শিখণ্ডী সম্রাটের হাত থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের একচ্ছত্র অধিকারলাভ। এর মধ্যে দেওয়ানিলাভের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানিলাভ, শুধু বাংলার নয়, গোটা ভারতবর্ষের পক্ষেই একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটা প্রধানত রাজনৈতিক ঘটনা। আর এই রাজনৈতিক ঘটনাটির পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল যে ঘটনাটি, যার কথা বাঙালি আজও ভুলতে পারেনি, যা বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদটিকে সজোরে নাড়া দিয়েছিল—সেটি হল কালো অক্ষরে লেখা দু'টি শব্দ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'।

"অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্নদা"

—অষ্টাদশ শতকের কবি রামপ্রসাদ সেনের নামে প্রচলিত, অজ্ঞাত কোন কবির রচিত এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটিতে অন্নের কাতর প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন বাংলার যে-অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রসঙ্গে প্রবেশের পূর্বে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থাটা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গেই আসা যাক।

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল জমিয়ে ব্যবসা করতে, রাজত্ব করতে

নয়। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে পরিস্থিতি যখন তাদের অনুকূল, মীর জাফর মৃত, মীরকাশিম পলাতক, মসনদে নাবালক নবাব নজম উদ্দৌলা। ওদিকে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম স্বয়ং সম্বলহীন অবস্থায় ইংরেজেরই সাহায্যপ্রার্থী। এই পরিস্থিতিতে শুধু বাংলাই নয়, সমগ্র ভাবতবর্ষের পক্ষেই যে প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসন আর দূরস্ত্ নয় —এই সহজ সত্যটুকু দূরদর্শী ক্লাইভের দৃষ্টি এড়ায়নি।

এরপরে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ আগস্ট দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে ২৬ লক্ষ টাকা কর দেবার বিনিময়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকারলাভ করে ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ভাবতের ভাগ্যনিয়ন্তা হবার প্রথম পদক্ষেপটি ফেললেন। কোম্পানির এই দেওয়ানিলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুবার ভালোমন্দের দায়িত্বও স্বাভাবিকভাবেই হল কোম্পানির। কিন্তু সুচতুর ক্লাইভ এক রাজনৈতিক চালে সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন। তিনি বাংলা ও বিহারের রাজস্বেব দায়িত্ব যথাক্রমে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায়ের ওপর অর্পণ করলেন। শুরু হল দ্বৈতশাসন। ক্ষমতা ও অধিকার থেকে দায়িত্বকে বিচ্ছিন্ন করে সুবা বাংলায় সৃষ্টি হয় কিম্ভূতকিমাকার এক শাসনব্যবস্থা, যার পরিণাম বাংলার জীবনে অচিরেই ডেকে আনে এক চরম বিপর্যয়।

মীরজাফরের আমলে যখন বাংলার রাজস্বের সুনির্মিত বনিয়াদে প্রথম ফাটল দেখা দিয়েছিল—ব্যাপক অর্থে মন্বন্তরের বীজ রোপিত হয়েছিল তখনই। পরে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মীরকাশিম কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম 'নজরানা' দিলেন নবাবীর বিনিময়ে। আগেই দেওয়া হয়েছিল ২৪ পরগনার জমিদারি। ইংরেজ কোম্পানির এই জেলাগুলির রাজস্ব-ব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে, তার বিশ্বগ্রাসী লোভের সঙ্গে পরিচয় হল বাংলার সাধারণ মানুষের। ইংরেজের এই দেওয়ানিলাভ বাংলার বুকে যে লোভের থাবা বসাল, তাতে বাংলার অর্থনীতি দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলল, যা আলিবর্দীর সময়ে

বারবার মারাঠা আক্রমণের ফলেও ঘটেনি।[১]

এই দেওয়ানিলাভের পরেই কোম্পানির সর্বপ্রথম চিন্তা ও চেষ্টা ছিল এদেশ থেকে যতটা সম্ভব বেশি অর্থ সংগ্রহ করা। ফলে শুরু হয়ে গেল ধ্বংসাত্মক লীলা।

জমিদারেরা সময়মত এবং চাহিদামত অর্থ সরবরাহ করতে না পারলেই সে-ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হত আমিলদের হাতে। আর এই দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমিলদের চরিত্র এবং ক্ষমতা—এই দুয়েরই রং বদল হয়েছিল। জেলার জমিদারকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়, নির্ধারিত খাজনার সামান্যতম অংশেরও খেলাপ হলেই তাঁকে বাতিল করে যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হবে তাঁর জমিদারি। আমিলদের তখন এমনই অপ্রতিহত ক্ষমতা।

নবাবী আমলে আমিলদের শায়েস্তা করবার জন্য থাকত কানুন-গোর দল। কিন্তু নতুন রাজস্ব-নীতিতে কানুনগোর ক্ষমতা গেল একেবারেই সঙ্কুচিত হয়ে। আর সেখানে আমিলদের ক্ষমতা হয়ে উঠতে লাগল অপ্রতিহত। এর ওপরে নায়েব-নাজিম রেজা খাঁ থেকে শুরু করে ইংরেজ সরকারের নিম্নতম কর্মচারীটি পর্যন্ত সকলেই কোম্পানির 'যথাসম্ভব বেশি' রাজস্ব সংগ্রহের রাজস্ব-নীতিটি সহজেই উপলব্ধি করে ফেলেছিল। আর এর শামিল হতে যে না পারবে, তাকেই সরে দাঁড়াতে হবে—এ কথা বুঝতে তাদের একটুও দেরি হয়নি। সুতরাং রায়তদের কল্যাণ-অকল্যাণের চিন্তা যে-সব আমিলদের মধ্যে তখনও ছিল, সেই-সব পুরোনো আমিলরা অচিরেই বিদায় নিয়ে জায়গা করে দিল অধিক রাজস্বদানের শর্তে নিযুক্ত নতুন আমিলের দলকে। এরা নিজেদের কাজের সাহায্যের জন্যে বেছে বেছে সেইসব কর্মচারীকেই নিযুক্ত করতে লাগল, যারা শোষণ-পীড়ন-অত্যাচারে রীতিমত সিদ্ধহস্ত। ফলে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ আকাশচুম্বী হতে বেশি দেরি হল না। এই বিপর্যস্ত-অর্থনীতি বাংলার বুকে নেমে এল আর এক চরম অভিশাপ। প্রকৃতির রুদ্ররোষ নেমে এল বাংলায়। খরা। দু'বছর

উপর্যুপরি অভূতপূর্ব এক খরা। আর তার সঙ্গে কোম্পানির সীমাহীন অর্থলোভ, সর্বব্যাপী দুর্নীতি, চরম দায়িত্বহীনতা আর প্রশাসনিক ব্যর্থতা মিলে নিষ্পেষিত নিপীড়িত বাংলার জনজীবনে ঘন কালো দুর্যোগের ছায়া নেমে আসে—সৃষ্টি করে সর্বকালের এক মহামন্বন্তর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাংলা সন ১১৭৬, ইংরেজি ১৭৭০। পর পর দু'বছরের খরার ফলে বাংলায় যে সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রস্তুতিপর্ব চলছিল দীর্ঘকাল ধরে।

দুর্ভিক্ষের জন্য আবহমান কালের রাজা-প্রজা সকলেই খামখেয়ালী প্রকৃতিকেই দায়ী করে থাকে। এটাই নিয়ম। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে প্রকৃতির খাম-খেয়ালীপনা অর্থাৎ অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি যে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তা বলাই বাহুল্য। মন্বন্তরের পূর্ববর্তী সে অনাবৃষ্টি শুরু হয়েছিল ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে, চলেছিল ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম পর্যন্ত।[২] এই মন্বন্তরের পূর্ববর্তী খরার খবর সমসাময়িক চিঠিপত্রে কিছু কিছু পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করছি।

"...দেশে সুকা হইয়া খরচ পত্র ব্যমহ হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইতেছি আমি এদেসে চাকরি করিতে আসা কেবল নাচারিতে দিনপাত হয় না নানান রূপ দায়গ্রস্থ এতদর্থে...ডিহি মুহরি হইয়া আশীয়াছি দরমাহা পাঁচ টাকায় চাকর... ।"[৩]—অর্থাৎ মন্বন্তর ঘোষিত হবার আগে থেকেই অভাব-তাড়িত মানুষ দেশান্তরে চাকরি করতে বেরিয়ে পড়েছিল।

প্রকৃতি বিরূপ হয়েছিল দু'বছর আগেই। সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের 'আমন' নষ্ট হয়ে গেল। ধানের দর চড় চড় করে উঠে গেল। বৃষ্টি নেই একফোঁটাও। এরই সঙ্গে গ্রীষ্ম এল। দিন-তারিখের হিসেবে বর্ষাও এল। কিন্তু আকাশ নির্মেঘ, রুদ্রবর্ণ। আউশ ধান সামান্য হলেও, রোদে পুড়ে ঝলসে গেল আশার ফসল আমন। ধানখেত শুকনো খড়ের মাঠে পরিণত হল। ধান-চালের দর হল

গগনচুম্বী। তারপর একদিন তাও বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। ছিটেফোঁটা বীজধানও রইলনা কোথাও।

বিহারের নায়েব-নাজিম রাজা সিতাব রায় যখন ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে চম্পারনে ছিলেন, তখনই তাঁকে খরার দরুন প্রজাদের দুর্দশা বিবেচনা করে আগের বছরের রাজস্বের মোট পরিমাণ থেকে অর্থাৎ ৪,৯২,০৭৫-০-০ টাকা থেকে ৮৯,২৩৭-১০-০ টাকা মকুব করতে হয়েছিল। পাটনা থেকে রেসিডেন্ট রামবোল্ড সিলেক্ট কমিটিকে ঐ বছরের ২৪ নভেম্বর লিখে জানালেন, বিগত বহুবছরে, বিশেষ করে বিহারে এমন প্রচণ্ড খরার কথা গ্রামের কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিও স্মরণ করতে পারছে না।[৪] এর ফলে বিহারের 'ভাদাই' বা 'আউশ' এবং বাংলার 'চৈতালী' শস্য একেবারেই জন্মায়নি এবং অনাবৃষ্টির ফলে ডিসেম্বরে শস্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে শস্যমূল্য উধ্বর্গামী হয়।

দরবারের রেসিডেন্টের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মুর্শিদাবাদে টাকায় ৬৷৭ সের চাল বিক্রি হয়েছে। আর জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদ সহরের ৩০ মাইলের মধ্যে টাকায় ৩ সের চাল বিক্রি হয়েছে, যেখানে সাধারণভাবে মোটা চালের দর টাকায় ৫ থেকে ৬ মণ দরে ওঠানামা করে।[৫] মন্বন্তরের বছরের বীরভূম জেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে জেলার সুপারভাইজার হিগিনসন একে "বন্ধ্যা জনমানবহীন" দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য বছর যেখানে সাধারণভাবে টাকায় দুই থেকে আড়াই মণ চাল ছিল সুলভ, মন্বন্তরের বছরে তা দুর্লভ। যদিও পাওয়া যায়, তা সাধারণের নাগালের একেবারে বাইরে। টাকায় তিন সের মাত্র। সুতরাং মানুষ মরে পোকামাকড়ের মতই। মুমূর্ষু মানুষ সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পালায়। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী বীরভূমের গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬,০০০; ১৭৭১-৭২ খ্রীস্টাব্দে তা থেকে ১,৫০০টি গ্রামের নাম মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১১৭৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ

গ্রামের জনৈক ৭০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধের লেখা একটি পুঁথির পুষ্পিকা থেকে ১১৭৬ সালের অনাবৃষ্টির ফলে, পরের বছর অর্থাৎ ১১৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ পর পর এই দু'মাসের খাদ্যশস্যের বাজারদর জানতে পারা যায়। সেইসঙ্গে অনুমান করতে পারা যায় মন্বন্তর-কবলিত বর্ধমানের অবস্থা। কারণ প্রতিটি শস্যের মূল্যই এক টাকায় কতটা পাওয়া যায় তারও হিসেব সেখানে দেওয়া আছে।

১১৭৭ সাল জ্যৈষ্ঠ মাস

চাল	১২ সের	১ টাকা
ভোজ্যতেল	২১/২ সের	”
নুন	১৩ সের	”
কলাই (ডাল)	১১ সের	”

এর ঠিক এক মাস পরে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে চালের দর উল্লেখ করেছেন এক টাকায় চার সের।[৬] এর থেকে সহজেই আমরা ঐ সময়ের বাংলার গ্রামগঞ্জের চালের দর অনুমান করতে পারি।

এরই সঙ্গে বিপদের ওপর বিপদ নিয়ে এসেছিল এক সর্বগ্রাসী অগ্নিকাণ্ড। প্রচণ্ড দাবদাহে যখন দেশের সমস্ত নদীনালাগুলো শুকিয়ে গেছে, তখন ছোট ছোট মজুত গুদামগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আর সেইসঙ্গে ছাই হল মানুষের শেষ ভরসা। সম্ভবত মানুষ খিদের জ্বালায় লুঠপাটের আশায়ই এই আগুন লাগাত। বাংলার নায়েব-নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদ থেকে ১৭৭০ সালের ১৫ মে কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালেন—

"...There is no remedy against the decrees of providence. How can he describe the misery of the people from the severe droughts and the dearness of grain. Hitherto it was scarce, but this year it cannot be found at all. The tanks and springs are dried up and it is daily growing difficult to procure water.

In addition to these calamities, dreadful fires have occurred throughout the country, impoverising whole families and destroying thousands of lives. The small stores of grain which yet remained at Rajganj, Diwanganj and other places in the districts of Dinajpur and Purnea, have been consumed by fire. Hitherto each day furnished accounts of the death of thousands, but now lākhs of people are dying daily. It was hoped that there would be some rain during the months of April and May, and that the poor ryots would be enabled thereby to till their lands but up to this hour not a drop of rain has fallen. The coarse crop which is gathered in this season is entirely ruined, and though the seed for the August crop is sown during the months of April and May, nothing has been done in that direction for want of rain. Even now it is not too late and if there are a few showers of rain, something may be done. If the scarcity of grain and want of rain were confined to one part of the country, some remedy for the alleviation of distress could be found. But when the whole country is in the grip of famine, the only remedy lies in the mercy of God. The Almighty alone can deliver the people from such distress."[৭]

এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় মহামারি হিসেবে দেখা দিল বসন্ত রোগ।[৮] কার্টিয়ার এবং তাঁর পারিষদবর্গও স্বীকার করেছেন, দেশের এই অবস্থার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাংলা থেকে

গভর্নর ভেরেলস্ট ২৮ মার্চ একটি চিঠিতে জানান—

"...the distress of the people is so great that it cannot be described and requests the addressee to send by water as much grain as may be available with the greatest dispatch."[৯]

এমন অনেক অঞ্চল ছিল যেখানে মানুষ মানুষের মৃতদেহ ভক্ষণ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে।[১০] বীজধান আগেই খেয়ে ফেলেছিল অথবা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল চাষীরা। তারপর ঘাসপাতা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মানুষ বেঁচে রইল কিছুকাল। পরে গ্রামের নিরন্ন কঙ্কাল-মিছিল ভিড় করে শহরে। পথে-ঘাটে-প্রান্তরে অগণিত মানুষের মৃত-দেহ ঘিরে শিয়াল-শকুনের চলে মহোৎসব।

বুভুক্ষু মানুষও যে সেই অলৌকিক মহাভোজে যোগ দেয়, সরকারি নথিপত্রে তার প্রমাণ মেলে। সভ্য মানুষ খিদের তাড়নায় নরখাদকে পরিণত হয়। মৃত নরমাংসেও তার অরুচি নেই। এই যন্ত্রণার বিলাপ চলেছিল ১৭৭০-এর নভেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু পরের বছরের শস্য ভোগ করার জন্যে অনেকেই বেঁচে ছিল না। জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হ্রাসের পর এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। মন্বন্তরের পরের তিন বছর প্রচুর ফসল হয়েছিল, দাম কমে গিয়েছিল, তবু এমন অনেক অঞ্চল ছিল, যেখানে নতুন বছরের শস্যের কোন দাবিদার ছিল না। ঐ বছর ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার সদস্য কর্তৃপক্ষকে জানান যে, মন্বন্তর সম্পূর্ণ-ভাবে বন্ধ হয়েছে।[১১]

এই মন্বন্তরের ভয়াল থাবা সব জেলায় সমানভাবে পড়েনি। পূর্ণিয়ার সুপারভাইজার ডুকারেল জানান—

"The famine continued for about twelve months in a degree of severity hardly to be paralleled in the History of any age or country."[১২]

এই মন্বন্তরে একমাত্র পূর্ণিয়া জেলাতেই দু'লক্ষ লোক মারা

গিয়েছিল। নদীয়া জেলায়ও অবস্থা চরমে পৌঁছেছিল। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দেই এই জেলা থেকে শস্যাভাবের খবর প্রথম পাওয়া যায়। এখানকার অনুর্বর জমিতে স্বাভাবিক বছরেই রায়তদের অভাবের শেষ থাকে না। তাদের জীবিকানির্বাহ করে খাজনা দেওয়া এমনিতেই ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। মন্বন্তর এই জেলার রায়তদের একেবারে ধ্বংস করে দেয়ার ফলে জেলার চাষের প্রবল ক্ষতি হয়। নদীয়ায় ১৭৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে ছিল ১,০৭৬টি পরিবার। ১৭৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে ছিল মাত্র ৩৭৩টি। এর মধ্যে পলাতক পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৫৩টি। খাজনার দিক থেকে হিসেব করলে এদের মোট পরিত্যক্ত জমির পরিমাণ মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ষোল শতাংশ। নদীয়ার সুপারভাইজার ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের এক রিপোর্টে জানান যে, নদীয়া জেলার জমিদার অগ্রিম 'তাকাভি'[১৩] (taqavi) কর না দেওয়ায় যে লোক পূর্বে ২০ বিঘা জমি চাষ করত সে পাঁচ বিঘার বেশি চাষ করতে অসমর্থ হয়।[১৪]

মেদিনীপুর জেলায় প্রবল খরার দরুন শস্যহানির সঙ্গে পোকার আক্রমণ ভয়াবহ ধ্বংসের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। "ছেয়াসি (১১৮৬ ?) সালে ইজারা করিয়াছিলাম সে গ্রামে টোটা পড়িয়াছিল সেই টোটার দায়ে পলাতক হইয়া আঙ্গরোল গ্রামে গিয়াছিলাম তাহাতে এই পুথি বসিয়া লিখিয়াছিলাম ইতি...।"[১৫] আলোচ্য পুঁথির পুষ্পিকাটিতে দেখা যাচ্ছে মেদিনীপুর জেলার জনৈক লিপিকর গ্রামে টোটা অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলে পোকার আক্রমণে স্বগ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই জেলার সেই চরম দুর্দিন প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমিককে প্রভাবিত করেছিল। গরুর গাড়ির চালক এবং নৌকার মাঝি এত বেশিসংখ্যক মারা গিয়েছিল যে, লবণ ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন কিছুসময়ের জন্য সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গিয়েছিল। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ২০ এপ্রিল মহম্মদ রেজা খাঁকে লেখা একটি চিঠিতে বলা হয়েছে,

"...severel Calcutta Merchants have complained

to the writer to the effect that some time ago they advanced large sums of money for salt to the Zamin-der of Raimangal, but that up till now they not received any salt, nor has the money been returned to them."[১৬]

এই বিলম্বের কারণ ছিল যানবাহন সমস্যা। হিজলির জমিদার দু'জন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে যেখানে ১,১৫,৫৭০ মণ লবণ সরবরাহ করতে পেরেছিলেন আগের বছরের উৎপাদন থেকে, সেখানে ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ৪৬,৯৫১ মণের বেশি লবণ সরবরাহ করতে পারেন-নি।[১৭] এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া মেদিনীপুর জেলার লবণশিল্পের উপর কিভাবে পড়েছিল সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি। এই জেলায় পলাতক কৃষকদেরও প্রচুর জমি অকর্ষিত ছিল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই দেশত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী মারাঠাশাসিত অঞ্চল উড়িষ্যায় আশ্রয় নেয়। কেবল খাদ্য নয়, সেখানে তাদের কাজ পাবার সম্ভাবনাও ছিল অনেক বেশি।

মালদার বস্ত্রশিল্পেরও ক্ষতি করেছিল মন্বন্তর। এই দুর্যোগের থাবা এই জেলায় প্রচুর প্রাণ নিয়েছিল, আর যারা বেঁচেছিল তাদেরও এত দুর্বল করেছিল যে, পরের বছর কোম্পানির বস্ত্রব্যবসায়ের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। কারণ মালদার বয়নশিল্পীর সংখ্যাও মন্বন্তরের পরের বছরে অর্ধেক দাঁড়িয়েছিল। ফলে বস্ত্রশিল্পের মান নিম্নগামী ও মূল্য ঊর্ধ্বগামী হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই।

বীরভূম ও বর্ধমানে মৃত্যুর সংখ্যা এবং রায়তদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি। গ্রামের পর গ্রাম এই মন্বন্তরের কবলে পড়ে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এমনকি শহরেও এক-চতুর্থাংশ মানুষও ছিল না। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বীরভূম জেলার সুপারভাইজার এই জেলা সম্পর্কে লেখেন, "বহুশত গ্রাম সম্পূর্ণ জন-শূন্য। এমনকি বড় বড় শহরের এক-চতুর্থাংশ বাড়িতে মানুষের বসবাস

নেই। রায়ত চাষীর অভাবে এক বৃহৎ ভূখণ্ডের বিপুল সম্পদ অনাবাদী পড়ে থাকে।" এই গ্রামত্যাগের ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে যে বীরভূমের গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬,০০০ ; মাত্র ছ'বছর পরে তার মধ্যে ১,৫০০ পরিত্যক্ত গ্রাম ও সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের সরকারী বিবরণ অনুযায়ী আবাদী জমির এক-তৃতীয়াংশ পরিত্যক্ত হয়েছিল। এর পাঁচ বছর পরে তা অর্ধাংশে পরিণত হয়। কৃষি বিনষ্ট, শিল্প-বাণিজ্য একেবারে স্তব্ধ। বীরভূমের যে সূতী ও রেশম বস্ত্রের ভারতজোড়া নাম ও চাহিদা ছিল, তা মৃতপ্রায় অবস্থায় পরিণত হয়। বন্ধ হয়ে যায় চিনি ও লৌহশিল্পের কেন্দ্রগুলি। চাষীর অভাব সর্বত্র ব্যাপক, গভীর ও প্রতিকারহীন। কর্ষণযোগ্য ভূমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যাল্পতা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও সম্পূর্ণ মেটেনি। রায়তদের গ্রাম বা জেলা ছেড়ে চলে যাওয়া, সরকার এবং রাজাকে চিন্তিত করে তোলে। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের আমিনি কমিশনের (Amini Commission) রিপোর্টের তথ্য অনুসারে স্থানত্যাগের কারণে জমি চাষ না হওয়ায় রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। ফলে রাজাকে বিশেষ ভাতা দিয়ে সরকার রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বর্ধমানের কিছু অঞ্চলের শস্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর কিছু অঞ্চলের শস্য বেশির ভাগই নষ্ট হয়েছিল। পুঁথিসূত্রে এখবরও পাওয়া যায়। "...সন ১১৭৬ সাল মহামন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টি হইল সস্যি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলাভূমে হইল...।"[১৮] ফলে যে সমস্ত চাষীরা অন্তত ২০ বছর ধরে জমি চাষ করে আসছিল, তারাও নতুন করে বন্দোবস্তে না গিয়ে চাষ-আবাদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে দুটি চিঠি এখানে উল্লেখ করা যায়।

"মহামহিম শ্রীযুত রাজারাম রাএ জমিদার মহাসয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীসেখ জম্দু কস্য ইস্তফা পত্র মিদং লিখনং কাজ্যঞ্চ আগে

মহাসএর পতনি মাহালের তরফ জোতপিআরের সাকীম রসুলপুরের গেঠা পুস্কনির হেড়া কোন নাগা ৪ কাত ১॥ ডেড় বিঘা কাত জমা এক টাকা ১।৶ ছএ আনা সরবরাহ করিতে না পারিঞা ইমসন ষুরু হালে ইস্তফা করিতেছি মহাসএ অন্য প্রজাকে দিঞা আবাদ করাইবেন আমা হৈতে সব্বাহ হইতে পারে না এ কারণ ইস্তফা পত্র লিখিঞা দিলাম ইতি...”[১৯] অর্থাৎ রায়ত সেখ জঙ্গু দেড় বিঘা কৃষিজমির খাজনা এক-টাকা ছ’আনা দিতে না পেরে বছরের প্রথম থেকেই চাষে ইস্তফা দিয়ে জমি ছেড়ে দেয় এবং অপর কোন লোকের সঙ্গে নতুন করে বন্দোবস্ত করতে বলে। কারণ তার দ্বারা খাজনা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আলোচ্য জমিদার রাজারাম রায়ের গোমস্তা শ্রীকৈলাসনাথ মণ্ডল সেখ জঙ্গুর ‘হালে ইস্তফা’ দেওয়ার কারণ যে একটাকা ছ’আনা খাজনা দিতে না পারায় আমলাদের জুলুম, সে-কথা জমিদারকে লিখে জানিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে এও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, জমিদার রাজারাম যদি আমলাদের তলব করে পাঠান এবং তারা যদি লিখিতভাবে জুলুম না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবেই সেখ জঙ্গু উক্ত জমিতে আবার বহাল হতে রাজি, নতুবা নয়। এখন মালিকের যেমন ইচ্ছা তাই হবে। সে চিঠিটিও হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

“আজ্ঞাকারি শ্রীকৈইলাসনাথ মণ্ডল দণ্ডবৎ প্রণামা কোটী সতং নিবেদনঞ্চ আগে বিসসেস পরে নিবেদন সাঃ ডাঙ্গাপাড়ার শ্রীসেখ জোঙ্গু জোতপিআরের জমি ১ কীত্যা ইস্তফা করে কারণ এই জে প্রজা মাজুকুরকে জিজ্ঞাসা মোধ্যে জাহি করে জে ওই সালি মৌজে ওদ্ধপুরের দানিষদিগরের জুলুমে এ প্রজার এই জোমি ইস্তফা করে জদি দানিষ মণ্ডল দিগর হুজুরে তলপ করি জায় এবং একরার লিখীঞা জাবাদা করেন তবে এই জোমি প্রজা মজুকুর আবাদ করে নতুবা ওই জোমি তাইদ মাজুকুর দিগে আবাদ করাইতে হয় হুজুর মালিক এই বিসএর জেমত আজ্ঞা হইবেক তেমত হয় কোরিব ইতি...।”[২০]

এইভাবে জমি ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যাওয়া বা চাষ-আবাদ ছেড়ে অন্য উপজীবিকা গ্রহণ করার প্রসঙ্গে অনেক সময় একে অপরকে উপদেশ দিয়ে নিষেধ করেছে, এই ধরনের কিছু কিছু চিঠিপত্রও পাওয়া যায়। "···জমা জমির বিশয় পলানা কর্তব্য নহে অতএব কিছু খরচ হইবেক কৃসি জমি করিতে চারা কি···অন্নাভাব করা কি দেবতা জা করেন··· ।"[২১] অর্থাৎ জমিজমার বিষয়ে খরচ হয়েই থাকে। তার ভয়ে চাষাবাদ ছেড়ে পালানো উচিত নয়। আর অন্নাভাবের দায় দেবতার উপর অর্পণ করাই বিধেয়।

কৃষকরা দলে দলে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র দিনমজুরের কাজের সন্ধানে চলে যায়। কিন্তু অন্য গ্রামেও কাজের সুবিধে হয় না। কারণ নতুন লোককে কেউ কাজে লাগাতে চায় না। সমকালীন একটি পুঁথিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। "···যুক বছর দেবতা বরিসিল না য়তএব পুতি লিখিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতনপুর জাইতে লাগিল য়তএব চেলে ভাই চব্বিশ সের ২৪ সের হইল তাই মেলে নাই আর গ্রামের য়ন্থেখান লোকে অন্য জোটে নাই আর গ্রামের লোক বলে বেলঙ্কে লোক এ লোক রাখা হবে না জদি রাখা জায় তবে আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখা জায় তবে ওই লোক মাহ কাত্তিক মাসে জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমাদের দেশে জল হয়্যাছে বাড়ি জাই চলরে কম্ম বসাইতে হবে য়তএব রাখে না··· ।"[২২]

সহজ করে বলতে গেলে খরার বছরে চাষের কাজ বন্ধ। তাই পুঁথি লেখার কাজ করেন লিপিকর। দারুণ খরার কারণে চালের দর ঊর্ধ্বগামী হয়। টাকায় ২৪ সের। তাও পাওয়া যায় না। লোকে গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে (গৈতনপুর) কাজের সন্ধানে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও অপরিচিত লোককে কেউ কাজ দেয় না। কারণ এদের কাজে বহাল করলে অসুবিধে অনেক। নিজেদের চাকর ছাড়িয়ে এদের রাখা হলে যদি ঈশ্বরের কৃপায় বৃষ্টি হয় তবে এরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবে চাষাবাদ করতে। তাই এদের কেউ রাখে না। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে

গ্রামের অর্ধেক লোকেরই অন্নাভাবে দিন কাটে। এর মধ্যেই কিছু কিছু লোক গ্রামান্তরে জায়গা করে নেয়। ফলে জেলার বেশির ভাগ জমিই খাস বা পতিত হয়ে যায়। কোম্পানির শর্ত অনুসারে রাজস্ব মেটানোর ভাবনা বর্ধমানের রাজাকে আশঙ্কাগ্রস্ত করে তুলেছিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিয়ে রাজার ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি মঞ্জুর করলেন।

হুগলি জেলা বর্ধমানের চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওলন্দাজদের অধিকারভুক্ত চুঁচুড়াতে গঙ্গার তীরে পড়ে থাকা মৃতপ্রায় মানুষের দেহগুলিতে প্রাণ থাকতেই শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত এই জেলার আবার বিশেষ কতকগুলি পরগনা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সাতসিকা পরগনার নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিছুদিনের জন্য সেখানে এমন একজন লোক পাওয়া যায়নি, যে জেলার খাজনা সংগ্রহ করতে পারে।[২৩] পরবর্তী বছরগুলিতেও এই জেলায় শ্রমিকের অভাব লক্ষণীয়। সাধারণত কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে শ্রমিক সরবরাহ করা হত এই জেলা থেকেই। কিন্তু মন্বন্তরের পরে এই জেলায় শ্রমিকের সংখ্যা প্রবলভাবে কমে যাওয়াতে মাথাপিছু মাসিক চার সিক্কা টাকার পরিবর্তে ছয় সিক্কা টাকাতেও লোক পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। হুগলির ফৌজদার মহম্মদ রাজিউদ্দীন খানের সঙ্গে সরকারপক্ষের পত্রের আদান-প্রদান থেকে এ খবর পাওয়া যায়। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তারিখে লেখা একটি চিঠি এখানে উল্লেখ করছি। চিঠিটি পড়লে এই জেলায় শ্রমিক-মৃত্যুর হার কি পরিমাণ হয়েছিল তা অনুমান করতে অসুবিধে হবে না।

"To Raziud-Din Mahammad Khan, Faujdar of Hooghly.—Has received the Khan's letter saying that workman cannot be had for less than a monthly rate of Rs. 6 per man. Is surprised to hear this, for the workman from Murshidabad are satisfied with

Rs 4 per man in spite of the greater distance they have come from and of the great scarecity that prevails at Calcutta. Desires the Khan to try to procure workman at a monthly rate of Rs 4 per man and send them to Calcutta."[২৪]

এর উত্তরে হুগলির ফৌজদার মহম্মদ রাজিউদ্দান যা লেখেন তার সারমর্ম হল, ঐ টাকায় বর্তমানে কোন শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পেলে তিনি জানাবেন।

২৪ পরগনা জেলায় মৃত্যুর হার অন্যান্য জেলার চেয়ে কম হলেও এখানকার ক্ষুধার্ত মানুষ গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল এ কথাও জানতে পারা যায়।[২৫] ফলে মন্বন্তরের পরবর্তী বছরগুলিতে তাদের রোগভোগে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে প্রবলভাবে।

বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পতিত জমিতে পরিণত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরে পুকুর শুকিয়ে যাওয়ায় জলের অভাবে কৃষকদের চাষ বন্ধ হয় এবং খাদ্যের অভাবে ও রাজস্বের দাবি মেটাতে না পেরে তারা জেলা ছেড়ে পালিয়ে যায়। রাজস্ব বাকি পড়ার অভিযোগে রাজাকে বন্দী করা হয়।

সমগ্রভাবে বলতে গেলে মন্বন্তরে বাংলার অধিবাসীর অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মারা গিয়েছিল, আর চাষীদের মধ্যে অর্ধেকই মারা গিয়েছিল। এ সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক চিঠিতে বিলেতের কর্তৃপক্ষকে লিখে পাঠান—

"I was not in Bengal at the time of the famine, but I had always heard the loss of inhabitants reckoned at a third and in many places near one-half of the whole."[২৬]

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে দরবারের রেসিডেন্টের রিপোর্টে জানা যায়, গত কয়েকমাসের বিপর্যয়ে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল "Six to

Sixteen of the whole inhabitants." জন মিলের মতে, "The first year of his (Cartier's) administration was distinguished by one of those dreadful famines which so often affect the provinces of India– a calamity by which more than a third of the inhabitants of Bengal were computed to have been destroyed."[২৭] ওয়ারেন হেস্টিংসের মতে, "···at least one third of the inhabitants of the province"[২৮] অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মন্বন্তরের বিভীষিকা সরকারী কর্মচারীদের রিপোর্টে ফুটে উঠলেও কোম্পানির ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়নি। খাজনা আদায়ের ওপরে এই মন্বন্তরের কোন প্রতিক্রিয়াই ছিল না। হাণ্টারের ভাষায় বলতে গেলে,—

"Remissions of the land-tax and advances to the husbandmen, although constantly urged by the local officials, received little practical effect. In a year when thirty five percent of the whole population and fifty percent of the cultivators perished, not five percent of the land-tax was remitted, and ten percent was added to it for the ensuing year (1770-71)"[২৯]

কোম্পানির দেওয়ানিভুক্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের বছরে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পেলেও, পরবর্তী বছরের সংগ্রহ আশাতীত। ১৭৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ আগের বছরের চেয়ে ৮,৫৬,৮৮২ টাকা বেশি হয়েছিল। এর পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৭৭১-৭২ খ্রীস্টাব্দে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল দু'গুণেরও বেশি। নীচের ছকটি[৩০] থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বছর	মোট আয়	বৃদ্ধির পরিমাণ
১৭৬৯-৭০	১,৩১,৪৯,১৪৮ টাকা	
১৭৭০-৭১	১,৪০,০৬,০৩০ টাকা	৮,৫৬,৮৮২ টাকা
১৭৭১-৭২	১,৫৭,২৬,৫৭৬ টাকা	১৭,২০,৫১৬ টাকা

মন্বন্তরে যাঁরা বেঁচে ছিল তাদের ওপর অতিরিক্ত 'নাজাই' (Najai) কর ধার্যের ফলে এবং শস্যমূল্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। বীরভূমে এই 'নাজাই' করেরই নাম 'জোত পতিত'। এই নতুন কর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হেস্টিংস লেখেন, "ব্যাপক হারে মৃত্যু বা দেশত্যাগের কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে রাজস্বের যে অনিবার্য ক্ষতি হয়, তা পূরণের জন্য জীবিত বা মৃতপ্রায় বাসিন্দাদের ওপর সরকারের ধার্য করের নাম 'নাজাই'।" তাঁর মতে, রাষ্ট্রকে রাজস্ব-হানির ক্ষতিপূরণ জোগানো, দল বেঁধে দেশত্যাগের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা সৃষ্টি করা, পতিত জমির অজুহাত তুলে রাজস্ব আদায়কারী কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের অংশবিশেষ জমা না দেওয়ার পথ বন্ধ করা—ইত্যাদি এই 'নাজাই' করের গুণ। তবে হেস্টিংস এ-ও স্বীকার করেছেন যে, "মন্বন্তরোত্তর বাংলায় এই করের দুর্বহতম বোঝা সেইসব গ্রামের হতভাগ্য জীবিতদের ওপরই চেপেছিল যে গ্রামগুলি সর্বাধিক জন-শূন্যতায় পীড়িত হয়েছিল।" এই খাজনা আদায়ের দায়িত্ব ছিল আমিল ও সুপারভাইজারদের ওপর। মন্বন্তরের পরের বছর রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে গোটা কৃতিত্বটাই ছিল সুপারভাইজার ও আমিলদের। আর এর সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল রেসিডেন্ট বেচারের। সুপার-ভাইজারের ওপর রিচার্ড বেচারের নির্দেশ ছিল আমিলদের এইসব কাজে তারা যেন বাধা সৃষ্টি না করেন।[৩১] ফলে রাজস্ব বহির্ভূত দাবি আদায়ে আমিলদের অত্যাচার রায়তদের কাছে মন্বন্তরের চেয়েও বিভীষিকাময় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এমনকি অনেক সময় তারা খুশি-মত 'নাজাই'-এর ছদ্ম আবরণে অন্যান্য করও ধার্য করেছে। কেবলমাত্র বীরভূম জেলাতেই মন্বন্তরের পরের বছর থেকে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই

ধরনের করের মধ্যে জোত পতিত, উটবন্দি, নিরিখবেশি, হরি মাথট, ভুরি মাঙ্গন ইত্যাদি বহু আবওয়াব বা বাড়তি কর ধার্য হয়েছিল।

শুধু আমিলরাই বা কেন, জমিদাররাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ মে তারিখে লেখা একটি চিঠিতে বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্র জানাচ্ছেন যে, যদিও এ বছরের মন্বন্তরের জন্য দরিদ্র দেশবাসীর দুঃখের অন্ত নেই, তবু খাজনা পুরোপুরিই আদায় হয়েছে। এবং পুরানো নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত আদায়ী খাজনা যেন তাঁকেই দেওয়া হয়। কারণ তাঁর পিতার মৃত্যুতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে, এ ছাড়া তা পরিশোধের অন্য কোন পথ নেই।[৩২]

দুর্ভিক্ষের পরের বছর নব-নিযুক্ত জমিদার হাট্ রায় তাঁর রায়তদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাজনার ওপরেও ৭১ হাজার টাকা আদায় করেছিলেন বলে জানা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজস্বের ব্যাপারে মন্বন্তরের কথা কিছুমাত্র বিবেচিত হয়নি।

জনসংখ্যা এবং আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পাবার ফলে জমিদার এবং ইজারাদার শ্রেণীভুক্ত ধনীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। হাণ্টারের মতে বাংলার পুরোনো জমিদারশ্রেণীর পতন শুরু হয়েছিল ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই। এই সময় বহু সংখ্যক জমিদার এবং রায়ত নির্ধারিত অঙ্কে রাজস্ব দিতে না পারায় জমি হারিয়েছিলেন। আর তার জায়গায় নতুন লোককে সে জমি বিলি করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের শেষদিকে বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদার বর্ধমানের মহারাজা মৃত্যুবরণ করলেন উত্তরাধিকারীর হাতে এক শূন্য রাজকোষ তুলে দিয়ে। নিঃসম্বল পুত্রপরিবারের সোনার থালা-বাসন গালিয়ে এবং ব্যবসায়ীদের কাছে ও সরকারের কাছে ঋণ করে পিতার পারত্রিক কর্ম সম্পাদন করেন।[৩৩] আর এরই ১৬ বছর পরে সেই অক্ষম যুবরাজ নিজ প্রাসাদেই বন্দী হন।[৩৪] বীরভূমের রাজা বাদ-উজ-জামান খাঁর অবস্থা হয়েছিল আরও

করুণ। রাজস্ব বাকি পড়ার অভিযোগে প্রথমে তাঁকে বন্দী করা হয়। তারপর রাজাকে বিশেষ ভাতা দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকার। আর এই ভাতা ক্রমশ কমতে কমতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছাল যে শেষপর্যন্ত কপর্দকশূন্য অবস্থা তাঁকে পথের ধূলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বিষ্ণুপুরের রাজাকেও রাজস্ব অনাদায়ে বন্দী করা হয়। নদীয়ার জমিদারিও রাজস্ব বাকি পড়ার কারণে সরকার গ্রহণ ক'রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত থেকে তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রকে দেয়। নাটোরের রানী ভবানী, যাঁর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা, তাঁকেও সাবধান করা হয় কোম্পানির রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারলে জমিদারি বাজেয়াপ্ত হবে বলে। এই একই কারণে বিষেণপুরের জমিদার দীর্ঘ শ্রান্ত কারাবাসের পরে মুক্তি পেলেন ইহজীবন থেকে মুক্তিলাভের ফলে। দিনাজপুরের রাজা বৈজনাথ প্রচুর রাজস্ব মকুব করায় কোম্পানির দাবির ১৩,৭০,৯৩২ টাকার মধ্যে ১,৭০,৯৩২ টাকা আদায় দিতে ব্যর্থ হলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে আনা হল অসহযোগিতার অভিযোগ। তিনি আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন জমিদারি হস্তচ্যুতির ভয়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই মন্বন্তর শুধুমাত্র কৃষক-শ্রমিক নয়, অভিজাত শ্রেণীর ওপরও প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। সে যাই হোক, যেখানে প্রায় ১০ মিলিয়নেরও বেশিসংখ্যক লোক শুধু অনাহারে মারা গিয়েছিল, সেখানে খাজনা আদায়ের হার যে একটুও কমেনি, এ কথা সহজ সত্য।

এই দুর্ভিক্ষের জন্য যদি শুধুমাত্র প্রকৃতির নির্মমতাই দায়ী হত, এর সঙ্গে যদি কোম্পানির নির্মম উদাসীনতা যুক্ত না হত, তবে হয়তো এই দুর্ভিক্ষ এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করত না। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বিহারের রেসিডেন্ট রামবোল্ডের পত্রে প্রথম এই মন্বন্তরের আভাস পাওয়া গেলেও, বিদায়ী গভর্নর ভেরেলস্ট তাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। অথচ ঐ বছরের ২৩ নভেম্বর কলকাতার কর্তৃপক্ষ কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্‌কে জানিয়েছিলেন,

"The melancholy prospect before our eyes of

universal distress for want of grain. As there in the greatest probability that this distress will increase and a certainty that it cannot be alliviated for six months to come, we have ordered a stock of grain sufficient to serve our army for that period, to be laid up in proper store houses."[৩৫]

১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর গভর্নর হয়ে এলেন কার্টিয়ার। নতুন বছর অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির শেষদিকে কার্টিয়ার প্রথম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি বাংলা-বিহারের মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা ফেব্রুয়ারি মাসেই জানালেন বিলেতের কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু মে মাসের মধ্যেই দু'লক্ষ মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে ভয়াবহ মন্বন্তর। সুতরাং এ কথা সহজেই বলা যায় যে, কর্তৃপক্ষের নির্মম উদাসীনতাই এই দুর্ভিক্ষকে ভয়াবহ রূপদান করতে সাহায্য করেছিল। অথচ কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতা সর্বৈব ছিল, একথাও বলতে পারা যায় না। কারণ, দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই সৈন্যদের জন্য শস্যসংগ্রহের খবর আমরা আগেই পেয়েছি। আর সে শস্য সংগৃহীত হয়েছিল ৮০ হাজার মণ।

বাংলার নায়েব-নাজিম রেজা খাঁ এই মন্বন্তরকে 'The decrees of providence'[৩৬] এবং পাটনার কাউনসিল, 'an accidental evil' বলে বর্ণনা করে সব দোষ প্রকৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, কোম্পানির দোষস্খালনের চেষ্টা করলেও, বিচার-বিশ্লেষণে তা ধোপে টেকে না। একেবারে মন্বন্তরের আকার ধারণ না করলেও, বাংলার অর্থ-নৈতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছিল দেওয়ানিলাভের সময় থেকেই। আর সেই দুর্যোগই ধাপে ধাপে একটু একটু করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মন্বন্তরের মুখে। এই বিপর্যয়ের জন্য আংশিকভাবে শস্যের অভাব দায়ী হলেও, ইংরেজদের একচেটিয়া কারবারের কথাও উল্লেখ-যোগ্য। তারা শস্যের দাম মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে এত উঁচুতে বেঁধে রেখেছিল যে, সাধারণ মানুষ তার প্রয়োজনের এক-দশমাংশও ক্রয়

করতে অসমর্থ ছিল। এ প্রসঙ্গে হাণ্টার বলেছেন,

"Not without reason does the court express its suspiction that the guilty parties 'could be no other than persons of some rank' in its own service ; and, curious to relate, the only high official who was brought to trial for the offence was the native Minister of Finance who had stood forth to expose the mal-practices of the English administration."[৩৭]

রেজা খাঁ ইংরেজ গোমস্তাদের একচেটিয়া চাল ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।[৩৮] সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, আলোচ্য কালোবাজারির অভিযোগ উঠেছিল দরবারের রেসিডেণ্ট স্বয়ং রিচার্ড বেচারের বিরুদ্ধেও। রেজা খাঁ নিজেও এই অভিযোগ থেকে মুক্ত ছিলেন না, যদিও তা ভিত্তিহীন বলে পরে প্রমাণিত হয়। হেস্টিংসের নির্দেশে রেজা খাঁকে বন্দী করে (এপ্রিল, ১৭৭২) মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় পাঠান হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ঘোষিত পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে প্রথমটি ছিল দুর্ভিক্ষের সময় চাল ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন। বলা হয়েছিল যে, তাঁর দালালরা চালভর্তি নৌকা দাঁড় করিয়ে জোর করে তাদের কাছ থেকে টাকায় ২০।৩০ সের দরে চাল কিনে, সেই চাল আবার টাকায় ৩।৪ সের দরে উপদ্রুত এলাকায় বিক্রি করেছে। এ-প্রসঙ্গে রেজা খাঁর বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা রেজা খাঁর নিজস্ব বক্তব্য—এই দু'টি চিঠির বয়ানই অত্যন্ত মূল্যবান।

"To Nawab Mahammad Riza Khan sends a translation of the charges framed against him by the court of Directors in their letter dated 28 Aug. 1769 ...he appressed the people of Bengal and committed acts of injustice. For instance in the famine

of 1769 when boats loaded with rice and other food stuffs were proceeding to Murshidabad, he stoped them and having forced the owners to sell him the rice a 25 to 30 seers for the rupee, he resold it to the people at 3 or 4 seers for the rupee."[৩৯]

"I have always been under the direction of the gentlemen of the council and the gentlemen of Motijhil (Resident of the Durbar) and the gentlemen of the council have sent many orders to the gentlemen of Motijhil which agreeably to the directions I have executed. If I have committed acts of violence and oppression, why did the gentlemen of Motijhil allow of it? In the affairs of rice, in the time of the famine, I was with the arrival of grain to retrieve the public distress. I had seven places appointed in the city for the distribution of charity."[৪০]

রেজা খাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠার কারণ হিসেবে মনে হয় কোম্পানির সৈন্যদের জন্য চাল সংগ্রহের ও বিক্রির দায়িত্ব ছিল রেজা খাঁর হাতে। স্বাভাবিক কারণেই চালের বেচাকেনার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। আর সাধারণ মানুষ তাঁর এই সরকারী কাজকে ব্যক্তিগত ব্যবসা বলে ভুল করেই তাঁকে এই অপবাদ দিয়ে থাকবে। রেজা খাঁ নিজে হয়ত এই ব্যাপারে দোষী ছিলেন না।

প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির কর্মচারীরা শুধু শস্যের একচেটিয়া কারবার করেই ক্ষান্ত ছিল না, পরবর্তী বছরের জন্য রক্ষিত বীজধানও বিক্রি করে দিতে তারা বাধ্য করেছিল। এ সম্পর্কে হাণ্টার বলেছেন,

"...the native agents of the governing body remain to this day under the charge of carrying off the husbandman's scanty stock at arbitrary prices, stopping and emptying boats that were importing rice from other provinces, and compelling the poor ryots to sell even the seed requisite for the next harvest."[৪১]

মুর্শিদাবাদে ইংরেজরা জোর করে টাকায় তিন থেকে সাড়ে তিন মণ চাল কিনে তা আবার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেছিল টাকায় ১৫ সের দরে।[৪২] মানুষের লোভ যে তাকে মানবতার টুঁটি চেপে কতদূর নীচে নামাতে পারে তা বোঝা যায় যখন দেখি মুর্শিদাবাদে খয়রাতী সাহায্যের ওপরও এদের লাভের থাবা বসাবার নগ্ন প্রচেষ্টা। দরবারের রেসিডেণ্ট বেচার মোরাদাবাদ, কাশিমবাজার ও বহরমপুরে ইংরেজদের কাছে চাল বিক্রি করেছিল টাকায় ১৫ সের দরে। আর মহম্মদ রেজা খাঁর কাছে খয়রাতী চাল বিক্রি করেছিল টাকায় ৬।৭ সের দরে। এবং সে চাল ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের।[৪৩] শুধু তাই নয়, কোম্পানির কর্মচারীরা এই সময় আরও লাভের একটা মস্ত সুযোগ খুঁজে পেল, শস্যের কালোবাজারি ব্যবসায়ের মধ্যে। দরবারের রেসিডেণ্ট এবং সেইসঙ্গে নায়েব-নাজিম, এই প্রসঙ্গে ইংরেজ কর্মচারীর গোমস্তাদের শস্যের একচেটিয়া ব্যবসায় এবং পূর্বোক্ত রায়তদের কাছ থেকে জোর করে শস্য, এমনকি চাষের বীজ পর্যন্ত কিনে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন।[৪৪] অবশ্য জোর করে শস্য মজুতের ব্যাপারেই হোক, আর কালোবাজারির ব্যাপারেই হোক, দেশীয় কর্মচারীরা সাহায্য না করলে বিদেশীদের পক্ষে এতদূর মুনাফা তোলার চেষ্টা সফল হতে পারত না নিঃসন্দেহে।

এইভাবে দেশজোড়া দুর্বিপাককে তারা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অপরপক্ষে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের খরার জন্য জমিদারদের খাজনা

থেকে কোনরকম অব্যাহতির পরিবর্তে তাঁদের এই বছরের খাজনার ঘাটতি পূরণের জন্য শতকরা ১২ ভাগ 'তাকাভি' (taqavi) করের ব্যবস্থা করবার জন্য চুক্তি করা হয়। এ ছাড়াও দেশীয় চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী রায়তদের ঘাটতি পূরণের জন্যও জমিদাররা দায়বদ্ধ ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সরকারী তরফ থেকে ঘাটতি পূরণের জন্য সাহায্য করার পরিবর্তে, অতিরিক্ত চাহিদা এই মন্বন্তরকে ভয়াবহতা দান করতে সাহায্য করেছিল।

মন্বন্তরের বছরে কলকাতায় এসেছিলেন বিলেত থেকে সদ্য আগত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক সিভিলিয়ান জন শোর। সেদিন বাংলার যে-ভয়াবহ দৃশ্য তাঁকে মর্মাহত করেছিল, দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরেও তাঁর স্মৃতিতে তা এমনই উজ্জ্বল হয়ে ছিল যে সেই স্মৃতিতে ভর করে তিনি তার ছবি এঁকেছেন একটি মর্মস্পর্শী কবিতায়। যা যে কোন বাস্তব বর্ণনাকে হার মানায়।

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue ;
Still hear the mother's shriecks and infant's moans,
Cries of despair and agonizing moans,
In wild confusion dead and dying lie :—
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey !
Dire scenes of horror, which no pen can trace.
Nor rolling years from memory's page efface."[৪৫]

খাস কোলকাতায় যখন এই অবস্থা গ্রাম-গঞ্জে মানুষ তখন কুকুর-বেড়ালের মতই মারা যাচ্ছিল। খাদ্যের তুলনায় মৃতদেহের পরিমাণ বেশি হওয়ায়, তাই লোকের খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। শতবর্ষ পরে লিখিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' মন্বন্তরের যে-ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত

চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথির পুষ্পিকায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বিষয়ক বর্ণনার প্রতিলিপি

হয়েছে তা কল্পনাভিত্তিক হলেও বাস্তবের সঙ্গে এর কোন অসঙ্গতি ছিল না।

এবারে আমরা সমসাময়িক পুঁথিতে প্রাপ্ত মন্বন্তরের বর্ণনার একটু উল্লেখ করব। সমকালীন একটি পুঁথির পুষ্পিকায় পাওয়া যায়, "…ষুক বছর দেবতা বরিসিল না য়তএব পুতি লিখিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতনপুর জাইতে লাগিল য়তএব চেলে ভাই চব্বিশ সের ২৪ সের হইল তাই মেলে নাই আর গ্রামের য়দ্ধেখান লোকে অন্ন জোটে নাই আর গ্রামের লোক বলে বেলডেক লোক এ লোক রাখা হবে না জদি রাখা জায় তবে আপনাদের জাদ চাকর ছাডিএ রাখা জায় তবে ওই লোক মাহ কাত্তিক মাসে জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমাদের দেশে জল হয়্যাছে বাড়ি জাই চলরে কম্ম বসাইতে হবে য়তএব রাখে না আর জে গ্রামের ধম্মকম্ম নাই আর গ্রামে মনুষ্য নাই আর গ্রামে মণ্ডল খোসামুদে হয় আর বোঙাগ্রি গ্রামে য়নেক কুড়খেক মণ্ডল আছে ইতি ১৬ আসার! দেখ ভাই খপরদার আয়ছে তৈসিলদার তারাচাঁদ আর তালুক নারায়ণ পোদাররে আর কি কহিব পউস মাসে লাগ্য জোরে।

পউস মাসে নাগলি চাটুজ্য ফজজদার গোমস্তা আর গোমস্তা রূপন নেউকি জোরে নাইরে নাই মানিক মণ্ডলের নাগীল সুয়া এত থানেই।"[৪৬]*

এখানে কেবলমাত্র মন্বন্তরের ভয়াবহ বর্ণনাই নয়, তার পরিণতি হিসেবে গ্রামের অর্ধেক মানুষের অনাহারে দিনযাপন এবং গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে বিকল্প কর্মের চেষ্টা এবং সেখানেও বিফল হবার বর্ণনা মেলে। এখানে দেখা যাচ্ছে মন্বন্তরের কবলগ্রস্ত মানুষ যখন দিশেহারা তখনও গ্রামের খোসামুদে মোড়ল, কুড়খেক মোড়ল, তসিলদার, তালুকদার, ফৌজদার, পোদ্দার, নেউগী ও গোমস্তাদের উৎপাত মানুষকে ভীত-

* পুষ্পিকাটির অংশবিশেষ পূর্বে একবার উদ্ধৃত হয়েছে।

সন্ত্রস্ত করে তোলে। এই সময় চাল টাকায় ২৪ সের হিসেবেও পাওয়া যায়নি, সে-খবরও পেলাম। আমরা এর পরে ১১৭৭ সালে লেখা একটি পুঁথির পুষ্পিকায় দেখব এই চালের দর কিভাবে অত্যন্ত দ্রুত সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল।

"··· সন ১১৭৭ সালের ১৭ জৈষ্টে বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল নিজ বাটীতে নিজ ঘরের দক্ষিণ দুয়ারের ঘরে পিড়াতে বস্যা লিখ্যা হইল···॥ সন ১১৭৬ সাল মহামন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টি হইল সস্থি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলাভূমে হইল টাকায় ১২ সের চালু।১০ সাড়ে ছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২॥ আড়াই সের লবন ১৩ সের কলাই ১১ সের তরি তরকারী নাস্তি কিছু মাত্রেক নাস্তি এই কথা সর্ত্তর বৎসরের মুন্বিসী বলেন আমরা কখন এমন ষুনি নাই ইহাতে কত ২ মুন্যিসী মরিল বড় ২ লোকের হাড়ী চাপে নাই বাং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্রতক মহা-প্রলয় হইল এই সন রহিল আর কীবা হয়। ···শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মনিস্যী নষ্ট হইল মহামন্বন্তর।"[৪৭]*

অষ্টাদশ শতাব্দের মন্বন্তরের ফলে বাংলায় যে-বিপর্যয় ঘটেছিল আলোচ্য পুষ্পিকাটি তার একটি প্রামাণিক দলিলবিশেষ। ১১৭৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে বসে লিপিকর শ্রীনন্দ-দুলাল দেবশর্মা চণ্ডীমঙ্গলের এই পুঁথিটির লিপি অন্তে পুষ্পিকায় বিগত '৭৬ সালের মহামন্বন্তরের বীভৎস স্মৃতির বর্ণনা করেছেন। তাঁর দীর্ঘ-জীবনে তো বটেই, এমনকি গ্রামের সত্তর বছরের বৃদ্ধরাও বলেছেন তাঁরা এত ভয়াবহ মন্বন্তরের কথা এর আগে কখনও শোনেননি। ১১৭৬ সালের অনাবৃষ্টির ফলে শস্য জন্মায়নি। ভোগ্যপণ্যের দর সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার ওপরে ছিল। তরিতরকারি, শাকসবজি কিছুই ছিল না। ফলে, সারা বাংলা জুড়ে দেখা দিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ।

* পুষ্পিকাটির অংশবিশেষ পূর্বে একবার উদ্ধৃত হয়েছে।

বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হল। অনেক অবস্থাপন্ন চাষীর ঘরে, বড় বড় লোকের ঘরেও চালের অভাবে হাঁড়ি চাপেনি। ১১৭৭ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত মহাপ্রলয় হওয়া সত্ত্বেও যে-সব মানুষ বেঁচে রইল, তাদের আগামী বছর কী অবস্থা হবে, একথা ভেবে লিপিকর মহাশয় আতঙ্কিত। কারণ, ১১৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যে চাল টাকায় ১২ সের ছিল, শ্রাবণ মাসে তা টাকায় ৪ সেরে দাঁড়ায়। এইভাবে চলতে থাকলে যারা বেঁচে রইল, আগামী বছরে তাদের ভবিষ্যতের দুঃসহ অবস্থার কল্পনায় লিপিকর স্বভাবতই শঙ্কিত।

মন্বন্তরে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা-বিহারের জনসংখ্যা ঠিক কত ছিল তা জানা না যাওয়ায়, এই এক-তৃতীয়াংশের সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব হয় না। তবে হান্টারের মতে ১০ মিলিয়ান লোকের মৃত্যু হয়েছিল।[৪৮]

এই সময় রাজধানীতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের দুঃসময় ঘনিয়ে এল। এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দৈনিক মৃত্যুর হার তখন প্রতি ১৬ জনে ৬ জন। বেচার পাঠালেন মুর্শিদাবাদের এক বীভৎস চিত্র। মৃতদেহ-অবরুদ্ধ রাস্তাঘাট পরিষ্কারের জন্য একদল লোককে নিয়মিত নিযুক্ত করা হয়েছিল। মৃতদেহগুলিকে নদীতে ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে, পরে তারা নিজেরাও মরেছে। এই সময় শিয়াল, কুকুর আর শকুনিরাই ছিল রাস্তা-পরিষ্কারক। পূতিগন্ধময় বাতাস ও আর্তস্বর এড়িয়ে চলাফেরা ছিল একেবারে অসম্ভব।[৪৯] এই খাদ্যাভাব, জলাভাব এবং স্তূপীকৃত মৃতদেহগুলি পরের বছর প্রচুর বর্ষার শেষে বাতাসকে বিষাক্ত করে ডেকে এনেছিল মহামারিকে, যা সমাজের উচ্চতর স্তরের মানুষকেও অব্যাহতি দেয়নি। রেজা খাঁর এক আত্মীয় এবং তাঁর স্ত্রী বসন্তরোগে প্রাণ হারালেন। রায়তরা তাদের সন্তানদের বিক্রি করতে প্রস্তুত কিন্তু ক্রেতার অভাব দেখা দিল শেষের দিকে।

"All through the stifling summer of 1770 the

people went on dying. The husbandmen sold their cattle ; they sold their implements of agriculture ; they devoured their seed-grain ; they sold their sons and daughters ; till at length no buyer of children could be found ; they ate the leaves of trees and the grass of the field ; and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on dead. Day and night a torrent of famished and disease-stricken wretches poured into the great cities."[৫০]

দেশের সর্বত্র মানুষ যখন মানুষের মৃতদেহ খেয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করেছে, হাণ্টারের মতে তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত ৩০ কোটি লোকের জন্যে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৯০ হাজার টাকা—যা ছিল অমানুষিকভাবে অপ্রতুল (inhumanly inadequate)। দুর্ভিক্ষের প্রথমদিকে ছ'মাসের জন্যে সাহায্যের যে তহবিল গড়ে উঠেছিল তাতে কোম্পানি ৪০,০০০ টাকা, রেজা খাঁ ১৫,২৫০ টাকা, নবাব মোবারক-উদ্দৌলা ২১,০০০ টাকা, মহারাজা মহিমদেব ৬,০০০ টাকা এবং জগৎশেঠ ৫,০০০ টাকা দেন।[৫১]

একদিকে প্রয়োজনের তুলনায় কোম্পানির এই নগণ্য পরিমাণে সাহায্য, অন্যদিকে এই সময় কোম্পানি মুর্শিদাবাদে বাখরগঞ্জী চাল বিক্রি করে লাভ করেছিল ৬৭,৫৯৩ টাকা।[৫২] অবশ্য নায়েব-নাজিম ও অন্যান্য দেশীয় ধনীদের দান-খয়রাতী ছিল উল্লেখযোগ্য। নায়েব-নাজিম রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে সাতটি দানকেন্দ্র খুলেছিলেন। হাজার হাজার লোকের সেবা করা হয়েছে সেখানে। হুগলি, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলেও এ-ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে জনসংখ্যার তুলনায় এ-সাহায্য যে খুবই নগণ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর বীরভূমের একটি মহাভারতের পুঁথির পুষ্পিকায়, লিপিকর শ্রীঅনন্ত-

রাম শর্মার 'সামান্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হৈয়া' পুঁথি নকল করার বর্ণনা এবং ভবিষ্যতেও 'বৎসর ব্যাপিয়া' সেই অন্নসত্রের দানে জীবন পরিপালনের প্রতিশ্রুতিতে তৃপ্ত থাকার বর্ণনা মেলে।

সিতাবরায়েরও দান-খয়রাতী অল্প ছিল না। বিহারের সমস্ত অঞ্চল থেকে লোকে তাঁর লঙ্গরখানায় আসত।[৫৩] অনুমান করা যায় অন্যান্য জমিদারেরা অনেকেই নিজের নিজের এলাকায় কিছু কিছু ত্রাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। মানুষের মৃত্যুকে তবু রোধ করা যায়নি।

লোকক্ষয়ের ফলে একদিকে যেমন চাষের জমি নষ্ট হয়ে জঙ্গলে পরিণত হল, অন্যদিকে দেখা দিল শ্রমিক সমস্যা। মন্বন্তরের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদকদের থেকে ক্রেতাদের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষই বেশি প্রাণ হারিয়েছিল। কারণ তারা খাদ্যশস্য উৎপাদন করত না। তাই তারাই প্রথমে মন্বন্তরের বলি হয়েছিল। সেজন্য মন্বন্তরের পরবর্তী বছরগুলিতে চাষে বা শিল্পের প্রয়োজনে শ্রমিক সংগ্রহ করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠল। আবার প্রতিরোধ ক্ষমতা সব থেকে কম বলে, মারি-মন্বন্তরে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেই মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি। এর ফলে কৃষিযোগ্য জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যাল্পতা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও পুরোপুরি মেটেনি। মন্বন্তরের পূর্বে কর্ষণযোগ্য জমি ও শ্রমিকের সংখ্যার মধ্যে একটা ভারসাম্য মোটামুটি বজায় ছিল। এই সময় অঢেল পরিত্যক্ত চাষের জমির পরিমাণের অনুপাতে চাষার সংখ্যা অনেক কমে যাওয়ায় জমিদারদের (মালিক অর্থে) মধ্যে প্রজাসংগ্রহের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এর সঙ্গে যুক্ত হল নব-উদ্ভাবিত 'নাজাই' কর। দুর্ভিক্ষের পরের বছরগুলিতে যে-সব রায়তরা বেঁচে ছিল তাদের খাজনা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু বা দেশত্যাগজনিত ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য এই অতিরিক্ত পরিমাণের কর ধার্য করা হয়েছিল। এর পরিণতি হিসেবে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত করে প্রজার চরিত্রে পরিবর্তনের সূচনা করল—ভূমিজ চাষী ও ভূমিহীন

চাষী। ভূমিজ চাষী অর্থে গৃহস্থ চাষী, যারা পূর্বপুরুষের ভিটেমাটির টানে অথবা জমিদারদের ঋণের বোঝার কারণে, দুর্ভিক্ষের পরেও পুরোনো জমিতে টিকে রইল। আর ভূমিহীন চাষী বা গৃহহীন চাষী বলতে, যারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত গুরুত্বহীন চাষী হিসেবে সমাজে অবস্থান করছিল, তারা তখন পুরোনো মাটির মায়া কাটিয়ে নতুন মাটির সন্ধানে পথে নেমেছিল—লোকক্ষয়ের কারণে জমির ক্রমহ্রাসমান মূল্যের সুযোগ গ্রহণ করতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মন্বন্তরের পরের বছরগুলিতে ভূমিহীন চাষীদের বেশ সুবিধে হয়েছিল। কারণ মন্বন্তরে জনশূন্য হয়ে যাওয়া জেলাগুলিতে জমির বাজারদর নেমে গিয়েছিল। এর সঙ্গে ভূমিজ প্রজার প্রতি প্রযুক্ত 'নাজাই' কর অনেক চাষীকেই জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছিল। এবং অন্যত্র গিয়ে সস্তায় জমিসংগ্রহের চেষ্টাও তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। অপরপক্ষে ভূমিহীন চাষীরা প্রলুব্ধ হতে লাগল স্বল্পমূল্যে জমিলাভের জন্য। এইভাবে ভূমিহীন রায়তের ক্রমবৃদ্ধি মন্বন্তর-পরবর্তী কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলার অর্থনীতিতে এক নতুন সংযোজন।

দুর্ভিক্ষের পরেও গ্রামত্যাগের হিড়িক বন্ধ হয়নি। কারণ যারা গ্রামে থাকত তাদের গ্রামত্যাগীদের জমির জন্য 'নাজাই' কর দিতে হত। মন্বন্তরের পরবর্তী সময়েও গ্রামত্যাগের এই ক্রমবর্ধমান প্রাবল্যের ফলে চাষীর অভাব সর্বত্র ব্যাপক, গভীর ও প্রতিকারহীন আকার ধারণ করতে থাকে। কৃষিসমস্যার জটিলতম দিক হয়ে দেখা দিল এই লোক-ক্ষয় হেতু কৃষকের অভাব। বিভিন্ন জেলার জমিদাররা এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করলেন জেলার বাইরে থেকে কৃষক আমদানি করে। এইভাবে বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি কয়েকটি জেলায় স্থানীয় সাধারণ আবাসিক বা 'খুদকস্ত' রায়তদের বঞ্চিত করে প্রবেশ ঘটল বহিরাগত বা 'পাইকস্ত' রায়তদের। সরকার এবং জমিদার উভয়পক্ষই দরাজ হাতে এদের নানান্ সুযোগ-সুবিধের প্রতিশ্রুতি দেয়। সুবিধে প্রচুর—এদের দেয় খাজনার পরিমাণ প্রচলিত খাজনার তুলনায় নগণ্য,

খাজনা দেওয়া হবে নগদে নয়—উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে, চাষে খেত-মজুর নিয়োগ করলে সেই স্বল্পপরিমাণ খাজনা থেকেও আবার টাকা-প্রতি চার আনা রেহাই পাবে। তার অর্থ, প্রায় বিনি-পয়সাতেই চাষ করে ফসল ঘরে তুলতে পারবে। এ ছাড়াও খাজনার দায়ে প্রতিবেশী জেলার জমিদাররা (যেখানে এরা খুদকস্ত বা আবাসিক চাষী) মামলা করলে, এরা সরকারি আশ্রয় পাবে সহজেই। বিভিন্ন জেলায় আগত এইসব পাইকস্ত রায়তরা কিন্তু নিজের নিজের গ্রামের মোড়ল। এদের জমিজমার পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেখানে খুদকস্ত রায়ত হিসেবে তাদের জমির খাজনা অত্যধিক। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী অর্থনৈতিক নৈরাজ্যে তারাও সেখানে জমিদার-সরকারের শোষণের শিকার। কিন্তু পার্শ্ববর্তী জেলায় পাইকস্ত হিসেবে তাদের কাছে নানা সুবিধের প্রলোভনের হাতছানি। সুতরাং বর্ষা সমাগমের আগেই এক জেলার খুদকস্ত চাষী তার দলবল নিয়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী জেলায় 'পাই-কস্ত' চাষী হিসেবে চাষের কাজ করতে। এদের মধ্যে কেউ কেউ পৈতৃক ঘরবাড়ি জমি-জায়গা ছেড়ে চিরকালের মত চলে আসে, কেউ বা সে-সব বজায় রেখে বাড়তি আয়ের চেষ্টায় আসে, আর কেউ বা জমিদারের খাজনা দিতে না পেরে বা ফাঁকি দিয়ে পাশের জেলায় পাইকস্ত রায়ত হিসেবে নাম লেখায়। আর সময় এলে ফসল কেটে জমিদারকে নাম-মাত্র খাজনা দিয়ে গাড়িবোঝাই ফসল নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু যারা সাতপুরুষের ভিটের মায়া কাটাতে পারে না, তারা জলে-কাদায় হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চড়াহারে খাজনা দিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবিত আবওয়াব-খাজনা দিয়ে মহাজনের সুদের খিদে মিটিয়ে ঘরে যা তুলল তাতে বছরের কয়েকটা মাসও চলে না। চরম দারিদ্র্য তাদের ভিখারীর পঙ্‌ক্তিতে নিয়ে যায়। তাই আবাসিক রায়তদের মধ্যেও শুধু যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হল তাই নয়, জেলায় জেলায় কৃষকদের মধ্যে বপন করল এক তীব্র ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব আর উত্তেজনার নতুন বীজ। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। কালক্রমে এরাই ডাকাতের দলে ভিড়ে যায়।

এইভাবে পুরোনো করদাতা চাষীরা যেমন দারিদ্র্যের কবলগ্রস্ত হল, সেইসঙ্গে পুরোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কারণ ঠিক এই সময়েই (১৭৭২) রাজস্ববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিকী কৃষিনীতি প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ খাজনার জমির বিলিব্যবস্থা হয়েছিল পাঁচ বছরের জন্য। ফলে, চাহিদা ও যোগানের নীতি ভূমিস্বত্বের প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে শুরু করল। এতে প্রজা ও জমিদারের পুরোনো সম্পর্কে ফাটল ধরল। রাজস্ববৃদ্ধিই যেখানে মূল লক্ষ্য, সেখানে যে বেশি টাকা দিতে পারবে, তাকেই পাঁচ বছরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হয়। এই পথেই কোম্পানির হঠাৎ বড়লোক হওয়া বেনিয়ানরা পরগনার পর পরগনা সংগ্রহ করে তাদের আর্থিক কৌলীন্যের সঙ্গে সামাজিক কৌলীন্য যুক্ত করল। আর এই নীতি বাংলার জমিদারদের পরিণত করেছিল জোতদারে। মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট লিখে পাঠিয়েছিলেন—

"I beg leave to ask whether the present Zaminders of the province may be permitted to turn farmers, for if they are not, there is nobody in the country to make proposals."[১৪]

পরিণতি হিসেবে গ্রামীণ অর্থনীতি একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তখন দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। সমসাময়িক তথ্যে এর প্রমাণ মেলে। মন্বন্তরের পরেও যে সব মানুষ টিকে রইল, তাদের মধ্যে অনেকে বাঁচার তাগিদে আঁকড়ে ধরল এই ঘৃণ্য প্রথাকে। মন্বন্তরের পরের বছর জনৈকা চারুবালা, লালা গুরুদাস রায়ের কাছে নিজেকে বিক্রি করেছিল। শর্ত ছিল কখনও পালাবার চেষ্টা করলে তাকে যেমন খুশি শাস্তি দেওয়ার অধিকার তার প্রভুর থাকবে।[৫৫]

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত চিঠিপত্রে ও দলিল-দস্তাবেজে এইধরনের নর-বিক্রয়ের খবর আরও মেলে।[৫৬] এ-প্রসঙ্গে

একটি দলিলের কথা এখানে উল্লেখ করছি। দলিলটি যদিও অনেক পরবর্তীকালের।

আলোচ্য[৫৩] দলিলটির বাগাড়ম্বরের আড়ালে যে বক্তব্যটুকু রয়েছে, তা হল 'এগার বৎসর বয়স্কা গৌর বর্ণা শ্রীমতী তারিণী কৈবর্তের মা তাকে শ্রীপঞ্চানন ঠাকুরের কাছে পাঁচ টাকার বিনিময়ে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করে। যদি কখনও এই শর্ত ভঙ্গ করে সে কন্যা নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তবে তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি পাবে—এই শর্তে রাজী হয়ে সে সজ্ঞানে এই পত্র লিখে দিয়েছে।

১১৭৭ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ মন্বন্তরের ঠিক পরের বছরের এইধরনের দলিল বেশকিছু পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষের চাপে অন্নাভাবে নিজেকে একক বা সপরিবারে বা শিশুকন্যা-শিশুপুত্রকে অপ্রত্যাশিত স্বল্পমূল্যে চিরদিনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে বিক্রি করছে। দীর্ঘ মেয়াদ অর্থে ৭০ বছরের জন্য, যা যাবজ্জীবনের নামান্তর। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এইসব দলিলে মেয়াদের পূর্বে মুক্তিলাভের কথাও উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। কিন্তু তার শর্ত এমনই উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে যে, সেই মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তিলাভ অন্তত যে ব্যক্তি অভাবের দায়ে সামান্য ৩ টাকায় আত্মবিক্রয় করে, তার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি দলিলে রয়েছে: 'মেয়াদ ৭০ বছর, সোয়া মণ হলুদের সিধা দিয়ে মুক্ত হতে পারবে।' অপর একটি দলিলে পাই: 'মেয়াদ ৭০ বছর, দশ মণ তামা দিলে তার পূর্বে মুক্তি পেতে পারে।'

এখানে আমরা ১১৭৭ বঙ্গাব্দের একটি আত্মবিক্রয়ের দলিল উল্লেখ করছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে ১৫ টাকার ঋণ পরিশোধার্থে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কা বিনী দাসী মাত্র ১৫ টাকায় আত্মবিক্রয় করছে—খোরাক-পোশাকের পরিবর্তে আজীবন দাসীকর্ম করবে এই শর্তে:

"ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্র মিদং শ্রীনীলকণ্ঠ সার্বভৌম মহাশয়ের শ্রীবিনী দাসী ধনিরাম দেএর স্ত্রী যোগীরাম সাধুর কন্যা বয়স ৩৫

পাঁতিস বৎসর কন্যা লিখনং আগে আমার শ্রীজয়নারায়ণের মারফৎ কর্জ্জ মহাজনের ১৫ পনর রূপাইয়া ছিল এ বিষয় ঋণাণু উপহতি এ নগদ মূল্য পাঁচ মিল দশমাসী পুরোজন ১৫ পনর রূপাইয়া পাইয়া আপন স্বেচ্ছায় মহাশয়ের স্থানে আত্মবিক্রয় হইয়া শ্রীজয়নারায়ণের মারফৎ আদায় মহাশয়েব হইলাম লওয়াজীমা খোরাক পোষাক দিয়া দান বিক্রয়াধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দাসীকর্ম করাইতে রহ ইতিসন ১১৭৭ সাংসন্থের বাংগলা সন ৫৮৮ পাঁচসয় আটঘৈট্র তে সাতৈ জৈষ্ট—"।[৫৭]

১১৭৭-৭৮ বঙ্গাব্দের এইধরনের আত্মবিক্রয় অথবা নিজ পুত্র-কন্যাকে অভাবের তাড়নায় বিক্রি করার দলিল অনেক মেলে।[৫৮] যেখানে ছয় বৎসরের শিশুকন্যাকেও সামান্য ৩ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবার খবর পাওয়া যায়।

এখানে আমরা এই শ্রেণীর আরও একটি দলিল তুলে ধরছি—সেখানে দেখা যাচ্ছে ২৭ বছরের শ্রীমতী কুঞ্জমালা নিজের এবং কন্যা শ্রীমতী মহামায়ার (বয়স ৭) অন্নবস্ত্রের অভাবে মহাকষ্টে মৃতপ্রায় হয়ে মাত্র তিন টাকার বিনিময়ে হু'জনেই আত্মবিক্রয় করছে। কারণ তাদের এমন কেউ নেই যে তাদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তাদের এই দাসীবৃত্তির মেয়াদকাল ৭০ বছর। এর পূর্বে যদি তারা কেউ মুক্তি পেতে চায় তবে সোয়া মণ হলুদ মালিককে দিয়ে মুক্ত হতে পারবে। যা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অর্থাৎ মাত্র তিন টাকার বিনিময়ে হু'হুটো লোক ক্রীতদাসী হয়ে গেল আজীবনকালের জন্য। পত্রটি নিম্নরূপ :

"ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম চান্দশী পরগণে বাঙ্গবোড়া সুচরিতেষু—

শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইষ বরিষ রঙ্গস্যাম জওগে রাম রুদ্রতৈ সাকিম পিঙ্গলকাঠী পরগণে আজীমপুর অস্য লিখনং আগে

আমী মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোষাক আজিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রঙ্গস্যাম এহার ও অন্ন বস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার অন্ন বস্ত্র দিয়া পরবিষ করে এমন না য়াছে অতএব আপন রাজিরকবতে সছেন্দ আক্লেবহাল তবিয়তে সেইস্ছা পূর্ব্বক আমি ও আমার কন্যা বহায় আপনার স্থানে মবলগ তিন রূপাইয়া পুরো ওজন দশমাসী চলন সহী দস্তবদস্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে নওয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত ৭০ সত্রী বরিষ দাসী অথ কর্ম্ম দান বিক্রীরধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈদ্ধে আচাদ হইতে চাহি তবে ১। সোয়ামণ হলদি সিধা দিয়া আচাদ হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পাচানবৈ শাল তেরিখ ১৪ চৌদ্দহী মাহে অগ্রহায়ণ—"।[৫৯]

একই সময়ের অপর একটি দলিলে[৬০] দেখা যায় শ্রীরামপুর অঞ্চলের শ্রীরামধন দত্ত 'মহোদুর্ব্বিক্ষো হালাক পেড়াসান' হয়ে অর্থাৎ মহাদুর্ভিক্ষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তাঁর ১৪ বছর বয়সের ক্রীতদাসকে ১২ টাকার বিনিময়ে হস্তান্তর করছেন।

এইভাবে মন্বন্তরে গ্রামের পর গ্রাম লোকবসতিশূন্য হয়ে যাওয়ায় জঙ্গলে পরিণত হল। কৃষকদের এই ব্যাপক হারে ভূমিত্যাগ এবং অকর্ষিত জমির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হওয়ায়, ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন পার্লামেন্ট বা সংসদ এই ক্রম-অবক্ষয়ের চিত্রটি বাইরের থেকে দেখতে পেয়ে (যার যথার্থ কারণ সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল), কৃষকশ্রেণীর এই ভূমিত্যাগের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের আদেশ দিল। কিন্তু শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে কোন অঞ্চলকে নতুন করে বসতিপূর্ণ করা যায় না। যাই হোক, জমি এইভাবেই অকর্ষিতপড়ে রইল বছরের পর বছর এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ তাঁর দীর্ঘ তিন বছরের সতর্ক অনুসন্ধানের শেষে জানালেন যে, বাংলায় কোম্পানির রাজ্য-সীমানার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল "...a jungle

inhabited only wild beast".[৬১] এর ফলে, দেশ জুড়ে চুরি-ডাকাতি চলতে লাগল অবাধে। এদের সঙ্গে দলে দলে যোগ দিয়েছিল না-খেতে-পাওয়া মানুষের দল। দুর্ভিক্ষের সময়ে যে-সব মানুষ পাহাড়ী অঞ্চলে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে গিয়েছিল, তারা শুধু আশ্রয়ের সন্ধানই পায়নি, পেয়েছিল নতুন জীবিকারও সন্ধান। সে-জীবিকা হল ডাকাতি। মন্বন্তরের সময় ভাগলপুর ও রাজমহলের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ অভাবের তাড়নায় পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কারণ সেখানে মকাই ও বোরো ধান নষ্ট হয়নি। সুতরাং তারা পার্বত্য অধিবাসীদের সঙ্গেই বছরখানেক থেকে যায়। কিন্তু মন্বন্তরের পরে যখন তারা নিজের নিজের অঞ্চলে ফিরে আসতে থাকে, তখন এদের আর কেউ বিশ্বাস করে সমাজে প্রবেশ করতে দেয় না এবং কোনরকম কাজেও নিযুক্ত করে না। বাধ্য হয়ে তারা আবার পাহাড়ী অঞ্চলে ফিরে যায় এবং ডাকাতি শুরু করে। তাদের পুরোনো আবাস নিম্নভূমির সবকিছু এত নখদর্পণে ছিল যে, পার্বত্য অধিবাসীদের চেয়েও এরা অনেক বেশি ভয়ানক ডাকাতের রূপ নিল। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে হুগলির কালেক্টর জানান, বিরাট সংখ্যক ডাকাতের আনা-গোনা দেখা দিয়েছে।[৬২] এর দায়িত্ব এদেশের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে দেশের জমিদারদের ওপর দিয়ে আর কোন সুবিধে হয়নি। পুর্ণিয়া থেকে ডুকারেন জানান, "এমন কোনদিন যায় না যেদিন কোন-না-কোন অঞ্চলে ডাকাতির খবর পাওয়া যায় না।"[৬৩]

এই ডাকাতের উৎপাত মন্বন্তরের পরের একটি উল্লেখযোগ্য ভাবনার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল বাংলার মানুষের জীবনে। ডাকাতদের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল মন্বন্তরের কবলগ্রস্ত সর্বহারা ক্ষুধার্ত মানুষের দল। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার কোর্ট অফ সারকিট রিপোর্ট দেয় :

"The crime of decoity has increased greatly since the British administration of justice and I know not

that, it has yet diminished."[৬৪]

এই ভয়াবহ, সর্বগ্রাসী এবং সর্বব্যাপী মন্বন্তর তৎকালীন মানুষের মনে এমন গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল যে, এর পঞ্চাশ বছর পরেও মানুষ অম্লান স্মৃতিতে তার বর্ণনা করেছে। এইরকম একটি বর্ণনার বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা যায় :

"...সন ১৭৭০ সালে বাংলা দেশে এইরূপ অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে নবাব ও অন্য ২ ভাগ্যবান লোকেরা দরিদ্র লোকেরদের মধ্যে অনেক তণ্ডুল দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে, তাহারদের ভাণ্ডার শূন্য হওয়াতে দান নিবৃত্ত হইল, ইহাতে অনেক দুঃখি লোক জীবনোপায় প্রত্যাশাতে তৎকালীন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান বসতি স্থান কলিকাতায় আইল, কিন্তু তখন কোম্পানীর ভাণ্ডারে দ্রব্যাভাব প্রযুক্ত তাহারদের কোন উপায় হইল না, ইহাতে সে দুর্ভিক্ষারম্ভের সপ্তাহ পরে সহস্র ২ লোক রাজপথে ও মাঠে স্থানে ২ পড়িয়া মরিল এবং কুক্কুর ও শকুনি দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বায়ু অনিষ্টকারী হইল, তাহাতে সকলের ভয় জন্মিল, যে এই দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎ মহামারী আসিতেছে, কোম্পানীর প্রেরিত একশত লোক নিযুক্ত হইল, তাহারা ডুলি ও ঝোড়া দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর নদীতে ফেলিত, তৎপ্রযুক্ত নদীর জল এমত শবেতে পূরিত হইল যে তাহার মৎস্য অখাদ্য হইল, এবং অনেক মৎস্যভোজী তৎক্ষণাৎ মরিল।

"...এই দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি বঙ্গভূমিস্থ লোকেরদের মন হইতে লুপ্ত হয় নাই এবং অনেক বৃদ্ধ লোকেরা আপনাদের যৌবনকালীন ক্রিয়ার সময় সেই দুর্ভিক্ষ বৎসর দ্বারা গণনা করেন, সেই সময়ে কলিকাতার উচ্চপদস্থ একজন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব দানার্থে তণ্ডুল সঞ্চয় করিতে উদ্যোগ করিলেন এবং লোকেরা স্ব ২ আহারার্থ স্ব২ সন্তান বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল, ইহাতে স্নেহ বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ কালের আহার মাত্র তাহারা পাইল, ঐ সাহেব অনেক চাকরের দিগকে আজ্ঞা করিলেন যে যত বালক বিক্রয় করিতে আসিবেক তাহারদিগকে ক্রয় কর এবং যাবৎ

তুর্ভিক্ষ থাকিবেক তাবৎ তাহারদিগকে আহার দেও। ইহাতে অনেক শত বালক তাহার দয়া প্রযুক্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল, পুনর্ব্বার সুভিক্ষ-কাল হইলে সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যে, যে ২ লোকের সন্তান আমার এখানে আছে তাহারা লইতে চাহিলে বিনামূলে তাহারদিগকে পাইবেক। এই আশ্চর্য যে ইহা শুনিয়াও পুত্র লইতে কেহই আইল না, কেবল এক বৃদ্ধা স্ত্রী বধির ও বোবা আপনার পুত্রকে লইতে আইল।"[৬৫]

তথ্যসূত্র

১. আলিবর্দীর সময় সুবার অবস্থা তেমন ভাল না থাকলেও, দেশে সুশাসন বজায় থাকার জন্য আক্রমণে বিধ্বস্ত গ্রামগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। নির্দিষ্ট রাজস্বের ওপরে অতিরিক্ত আদায়ের চাপ সৃষ্টি করা হত না বলেই মারাঠা-আক্রমণের দুঃস্বপ্ন দেশবাসীর মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে ফেলা সম্ভব হত।

২. Extracts from Records in the India Office, relating to Famine in India, 1769-81. Compiled by G. Cambell. [Letter of Rambolds, 1769.]

৩. বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিবিভাগে রক্ষিত একটি পত্র।

৪. N. K. Sinha, Economic History of Bengal. V. 2, p. 49.

৫. ibid.

৬. বিশ্বভারতী পুঁথিসংখ্যা ৬২৪০।

৭. Calendar of Persian Correspondence, V. 3, p. 64-65, Letter no. 209.

৮. 'বাংলার অর্থনৈতিক জীবন'—নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, পৃ. ২৯।

৯. Calendar of Persian Correspondence, V. 3, p. 41, Letter no. 153.

১০. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 22.

১১. N. K. Sinha, Econmic History of Bengal, V. 2, p. 60.

১২. ibid, P. 50.

১৩. জেলার রায়তদের হয়ে জমিদারের দেয় নতুন ধার্য কর।
১৪. N. K. Sinha, Economic History of Bengal, V. 2, p. 60.
১৫. বিশ্বভারতী পুঁথিসংখ্যা ৩৩২৩।
১৬. Calendar of Persian Correspondence, V. 3, p. 50, Letter no. 175.
১৭. N. K. Sinha, Economic History of Bengal, V. 2, p. 53.
১৮. বিশ্বভারতী পুঁথিসংখ্যা ৬২৪০।
১৯. ঐ, পত্র।
২০. ঐ, পত্র।
২১. ঐ, পত্র।
২২. ঐ, পুঁথি।
২৩. N. K. Sinha, Economic History of Bengal, V. 2, p. 52.
২৪. Calenda. of Persian Correspondence, V. 3, p. 7, Letter no. 38.
২৫. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 22.
২৬. N. K. Sinha, Economic History of Bengal, V. 2, p. 54.
২৭. The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, V. 3, p. 486.
২৮. ibid.
২৯. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 28.
৩০. ibid, Appendix A, p. 31.
৩১. N. K. Sinha, Economic History of Bengal, V. 2, p. 55.
৩২. Calendar of Persian Correspondence, V. 3, p. 199, Letter no. 739.
৩৩. ibid.
৩৪. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 57.

৩৫. The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commoms on the Affaires of the East India Company, V. I, Chap. X

৩৬. চিঠিটি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

৩৭. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 28.

৩৮. Extracts from Records in the India Office, relating to Famine in India, 1769-81. Compiled by G. Cambell, p. 45.

৩৯. Calendar of Persian Correspondence, V. 4, p. 6, Letter no. 33, dated May 22, 1772.

৪০. ibid, p. 41, 61-63, Letter no 210, 324 ; N. K. Sinha, Economic History of Bengal, V. 2, p. 60.

৪১. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 28.

৪২. Controlling Council of Revenue of Murshidabad, 3rd January, 1771.

৪৩. ibid.

৪৪. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 28.

৪৫. ibid, pp. 22-23.

৪৬. বিশ্বভারতীর পুঁথি।

৪৭. ঐ, ৬২৪০।

৪৮. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 27.

৪৯. 'Famine of 1770 and Town Murshidabad'—by Goutam Bhadra, In : Marxist Misellany, no. 7, p. 29.

৫০. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, p. 21-22.

৫১. N. K. Sinha, Economic History of Bengal, V. 2, p. 57.

৫২. ibid.

৫৩. ibid.

৫৪. ibid, p. 70.

৫৫. Studies in the History of the Bengal Subah—Kali Kinkar Datta, p. 494.

৫৬. বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত পত্র, সংখ্যা ১৯৪৩।

৫৭. দলিলটি বর্তমানে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র চিত্রশালায় আছে।

৫৮. 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'—যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ১ম সং, পৃ. ৩২৮ এবং Types of Early Bengali Prose, pp. 87, 89.

৫৯. 'সাহিত্য', ভাদ্র ১৩২০, পৃ. ৩৩৫-৩৬।

৬০. ১১৯৫ বঙ্গাব্দের এই দলিলটি বর্তমানে সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় আছে।

৬১. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal. p. 39.

৬২. "In October 1.88 the Calcutta newspaper announced that a Beerbhoom treasure party had been attacked on the South of the Adji, the military guard overpowered, five men stain and more than three thousand pounds worth of silver carried off."

Hunter, Annals of Kural Bengal, p. 17.

৬৩. N. K. Sinha, Economic History of Bengal, V. 2, p. 67.

৬৪. ibid, p. 64.

৬৫. 'বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ', দিগ্‌দর্শন, ১৮২০, পৃ. ৮১।

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ

১৭৪২ থেকে ১৭৫১ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ন'বছর একাদিক্রমে মারাঠা আক্রমণ বাংলার অর্থনীতিকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। তারপর ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে যে পালাবদল এল, শুধু রাজনীতির সীমিত গণ্ডির মধ্যেই তা আবদ্ধ থাকল না। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তা নিয়ে এল এক ব্যাপক ও গভীর আলোড়ন। আর তারই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে মানুষ ও প্রকৃতির রুদ্র রোষ নিয়ে দেখা দিল ১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দের মহামন্বন্তর—মৃত্যু আর মৃত্যু! এর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া নানা দিক থেকে বাংলার চেহারা বদলে দিয়েছিল।

মারাঠা আক্রমণ ও মন্বন্তরের পরে বাংলার প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে ভেঙে পড়েছিল, তাতে জেলাগুলির আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছিল। মন্বন্তরের পরবর্তী বছরগুলিতে ধানের দর উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে যায়। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ক্রমাবনতি এর একটা বড় কারণ। এছাড়া, পরপর তিন বছর প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠের ফসল যেন উপচে পড়ে। কিন্তু বাজারে এর প্রতিক্রিয়া হয় গুরুতর। বিপুল পরিমাণে শস্য বাজারে আমদানি হবার কারণে নগদে বিক্রি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। পাইকাররা দর আরও কমবার আশায় হাত গুটিয়ে বসে থাকে। বড় ও মাঝারি গৃহস্থরা বিপন্ন হয়ে পড়ে। জমিদারের খাজনা মেটাতে না পেরে অনেকে 'দানিসদিগের জুলুমে' জমিজমা ছেড়ে পালায়।[১] আটের দশকে দেখা দেয় আবার খরা, আবার শস্যহানি। ফলে কৃষিপণ্যের বাজারে দেখা দেয় বিচিত্র অস্থিরতা। খাদ্যশস্যের দাম হঠাৎ ওঠে, হঠাৎই নামে। ওঠা এবং নামা উভয় ক্ষেত্রেই সুদখোর মহাজনের লাভ। দর বেশি হলে গরীব চাষী-শ্রমজীবী ও নিঃসম্বলদের অনিবার্য উপবাস।

আর দর পড়ে গেলে ধনী ও মাঝারি চাষীদের পক্ষে জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ মিটিয়ে দিনযাপন দুষ্কর হয়ে ওঠে। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বীরভূম জেলায় ধানের দর হয়েছিল টাকায় চার মণ। ফলে ধনী ও মাঝারি চাষীদের মাথায় হাত। আবার এর দু'বছর পরে, ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ধানের দর হল টাকায় এক মণ পনেরো সের। গরীবের হাঁড়ি চড়েনি। কৃষিপণ্যের বাজারের এই অদম্য অস্থিরতার প্রভাব পড়ে সমাজের গভীরে। লোকচক্ষুর আড়ালে। এই খরা ও শস্যহানির বিচিত্র ধরনের খবর মেলে আঠারো শতকের আটের দশকে লেখা কয়েকটি পুঁথির 'পুষ্পিকা' অংশে। "...ই বৎসর আবাদ অল্প হইয়াছে ভাল রকমে হইল ইক্ষু পোস্তচ্ছ হয় নাই কাপাস টাকায় ৩৷৷০ চোর্দ্দ্য পুয়া তাই পায় নাই..."।[২] অর্থাৎ আবাদ অল্প হলেও আখের ফলন ভালই। পোস্ত হয়নি। আর কার্পাস তুলো টাকায় মাত্র সাড়ে তিন সের। তাও পাওয়া যায় না সব সময়ে।

"...গত সন দেবতা সুখা করিয়াছে এক্ষেণে চালের দর চর্ব্বিস পচিশ পাই আর কি প্রকার হয়..."।[৩] অর্থাৎ গতবছর খরা হওয়ায় এবছর চালের দর ঊর্ধ্বগামী। টাকায় মাত্র ২৪/২৫ সের। আরও কত দাম বাড়বে কে জানে!

"...ছেয়াসি সালে ইজারা করিয়াছিলাম সে গ্রামে টোটা পড়িয়াছিল সেই টোটার দায়ে পলাতক হইয়া আঙ্গরোল গ্রামে গিয়াছিলাম তাহাতে এই পুথি বসিয়া লিখিয়াছিলাম ইতি..."।[৪] অর্থাৎ লিপিকর '৮৬ সালে জমি ইজারা নিয়েছিলেন। কিন্তু পোকার উৎপাতে শস্যহানি হওয়াতে গ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী আঙ্গরোল গ্রামে বসে পুঁথি লেখা শুরু করেন জীবিকার কারণে।

শুধু চাষের ক্ষেত্রে নয়, কুটিরশিল্পগুলিরও তখন রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা। একসময় যে-সব শহর জনাকীর্ণ ছিল, এখন তা পরিত্যক্ত। শিল্পগুলি মুমূর্ষু হওয়ায়, যেখানে একসময় জমজমাট বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, সেখানে গুটিকয়েক দীনহীন কুঁড়েঘরমাত্র অবশিষ্ট।

অধিকাংশ মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছে। মোটামুটিভাবে এই ছিল সমগ্র বাংলার সাধারণ ছবি।

এই সময় বাংলার চাষী-রায়তদের একটা বড় অংশ নতুন জমাবন্দীর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানায়। আগের তুলনায় তাদের খাজনা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে—এই অভিযোগে তারা জমিদারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, খাজনার হার না কমালে তারা পাট্টা নেবে না। বস্তুত অনেক রায়ত নতুন হারে খাজনা দিতে অস্বীকার করে জেলা ছেড়ে চলেও যায়। ইজারাদাররা পড়ে বিপাকে। কিন্তু জমিদার অনন্যোপায়। সংকটত্রাণের ব্যর্থ চেষ্টায় তাগা-তাবিজের মতো নতুন নতুন খাজনা-আবওয়াব এই সময়ে ক্রমান্বয়ে চাষীদের ওপর চেপেই চলে। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে বীরভূমের জেলা কালেক্টর জানান, রায়তরা শুধু কমিটি অফ রেভিনিউর কাছে অভিযোগপত্রই পাঠায়নি, তারা তাদের জমি ছেড়ে ভিন্ন জেলায় আশ্রয়ও নিয়েছে। আর আদায় কমে যাওয়ায় বকেয়া সদর খাজনার বোঝা থেকেও মুক্তি পায় না জমিদাররা।

মন্বন্তরের পরবর্তী এই পরিস্থিতিতে পরিত্যক্ত গ্রাম জনপদ নগর আর অকর্ষিত কৃষিভূমির পাণ্ডুর বিস্তার ঘটতে থাকে ক্রমশই। দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামোও প্রায় ভেঙে পড়ে। দারিদ্র্য, হতাশা আর বিশৃঙ্খলার উর্বর ভূমিতে চোর-ডাকাত, সমাজ-বিরোধীর সংখ্যা হতে থাকে ক্রমবর্ধমান। আর সব ছাপিয়ে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধূমায়মান হয় গণ-অসন্তোষ—দেখা দেয় এক অভূত-পূর্ব গণ-বিদ্রোহ।

ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। একের পর এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বর্গীর হাঙ্গামা, রাজনৈতিক পালাবদল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, মন্বন্তরোত্তর নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ খাজনার ক্রমবর্ধমান বোঝা, সরকার ও জমিদারের যৌথ শোষণ ও নির্যাতন, ভূমিচ্যুত কৃষক, কর্মহীন কারুজীবী আর কর্মচ্যুত পাইক-পেয়াদা-চৌকিদারের ছন্নছাড়া বিশাল বাহিনী, খাদ্যশস্যের দরে প্রচণ্ড অনিশ্চিত ওঠা-নামা, আর তারই

সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্রুত ছড়িয়ে পড়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি এক সর্বাত্মক প্রশাসনিক ভাঙন। এর ফলে সর্বস্বান্ত কৃষক-প্রজা কেবল-মাত্র বাঁচার তাগিদেই এক বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায় পূর্ব-ভারতে দেখা দিয়েছিল এক অভূতপূর্ব বিদ্রোহ, যা পরিচালিত হয়েছিল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দ্বারা। আর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর (১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত)। এই বিদ্রোহের ঘটনাস্থল ছিল সমগ্র বাংলা ও বিহার প্রদেশ। সমগ্র অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ জুড়েই বাঙালির যে বিদ্রোহী মানসিকতার প্রকাশ পেয়েছিল তার সবচেয়ে বড় প্রকাশ ছিল সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। কিন্তু সেই গণ-বিদ্রোহটি কোন রাজ-নৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার অভিপ্রায়ে হয়নি—দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ফলশ্রুতি ছিল এই বিদ্রোহ। আর এই সংগ্রাম ছিল বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের হাত থেকে বাংলার জন-গণের আত্মরক্ষার সংগ্রাম।

ইংরেজ বণিকদের নতুন রাজতন্ত্রে গ্রামবাংলার পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে, বহু সম্পন্ন কৃষক পরিণত হয় ভূমিহীন কৃষক-মজুরে। সাধারণ চাষী-মজুররা এতদিন যে উপায়ে জীবিকা অর্জন করে এসেছে, তা পুরোনো গ্রামসমাজের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্তপ্রায়। চির-অভ্যস্ত জীবনের হঠাৎ পরিবর্তনে দিশেহারা কৃষক-মজুরদের কেবলমাত্র বাঁচার তাগিদই অসঙ্গত ও অসংহত নতুন জীবন-পথের সন্ধান দিল। অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ল অনেকেই। ইংরেজ বণিকদের কুঠি-কাছারি, আর জমিদার-জায়গিরদার-মহাজনদের ঘরের ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া ছাড়া তাদের আর বাঁচার পথ ছিল না। বাংলার জেলাগুলিতে এই অরাজকতার মূল কারণ সেই জীবনবৃত্তি আর ক্ষুন্নিবৃত্তির গভীরে নিহিত ছিল। এই অরাজকতার অনেক কারণ ছিল। কিছু কারণের উদ্ভব হয়েছিল দুর্ভিক্ষের আগে। নজমউদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানির সন্ধির (১৭৬৫) শর্ত অনুসারে নবাবের সৈন্যসংখ্যা কমানো হয়েছিল। যারা সৈন্যদল থেকে বরখাস্ত

হয়েছিল তারা জীবিকা-অর্জনের অন্য কোন উপায়ের অভাবে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি করত। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব কমসংখ্যক সিপাই নিয়োগ করতেন। তাদের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার কাজ ঠিকমতো করা সম্ভব হত না। অনেক সময় রক্ষকই ভক্ষক হত। সিপাইরা ডাকাতদের বাধা না দিয়ে তাদের লুঠের অংশীদার হত। কোন কোন জমিদারও এদের মদত দিতেন এবং লুঠের অংশে ভাগ বসাতেন। সরকারি কর্মচারীদের গতিবিধির সংবাদ ডাকাতদের জানিয়ে দিয়ে তাঁরা তাদের সতর্ক করে দিতেন। এদের মধ্যে সাধারণ ডাকাত ছাড়া একদল বিশেষ ডাকাত ছিল সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায়ের লোক। তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তরবাংলায়। দুর্ভিক্ষের অনেক আগে থেকেই তাদের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ শেষ হবার পরেও অনেক বছর চলেছিল।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বাংলার গ্রামগুলি ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষির সঙ্গে কুটির-শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরতা। কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে সৃষ্ট বিদেশী শাসনে, গ্রামের এই সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে, তাকে পরিবর্তিত করা হল ব্যক্তিভিত্তিকরূপে। আর এই নব-পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল অধিক রাজস্ব আদায়। ফলে, ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হল গ্রামবাংলার ওপর।

এদেশে চিরকালই শাসকবর্গের আয়ের প্রধানতম উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। ইংরেজ আমলের আগে রাজস্ব-সংগ্রহের সময় গ্রামকে ধরা হত এককরূপে ; সরকারকে রাজস্ব দিতে চুক্তিবদ্ধ থাকত সমগ্র গ্রাম। ব্যক্তির কোন ভূমিকা বা দায়িত্ব সেখানে থাকত না। প্রত্যেক গ্রাম বা মৌজায় একজন প্রাথমিক জমিদার বা গ্রামপ্রধান থাকতেন। অবশ্য এই জমিদার ইংরেজ আমলের জমিদার নন। অর্থাৎ এঁরা কখনই কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় চুক্তিতে মালিক ছিলেন না। এঁদের কাজ ছিল মৌজার সব রায়তের রাজস্ব নির্ধারণ করা এবং তা সংগ্রহ করে ঊর্ধ্বতন

কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত শস্যের ভিত্তিতে রাজস্ব জমা দিত গ্রামপ্রধানকে। হিন্দুযুগে এই রাজস্বের হার ছিল সাধারণভাবে উৎপাদনের একের ছয় ভাগ, আর মোগল আমলে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় একের তিন ভাগ। যেহেতু তখন বেশিরভাগ খাজনাই আদায় হত ফসলী বা খামার পদ্ধতিতে, তাই কি সরকার, কি রায়ত সকলেই কৃষির উন্নতির প্রতি যত্নবান ছিলেন। জমি যাতে অকর্ষিত না থাকে সেদিকে সর্বদা নজর দিতেন সরকারপক্ষ।

মোগল সাম্রাজ্য যখন ভাঙনের মুখে তখন গোমস্তা-জমিদার-জায়গিরদার-সামন্তরাজগণ যে যেভাবে যেখানে যা পেত লুটেপুটে নিতে আরম্ভ করল। চাষীরা তাদের ফসলের অর্ধেক দিয়েও অব্যাহতি পেতনা। এই অবস্থা চরমে ওঠে ইংরেজ আমলে। কোম্পানির দেওয়ানি-লাভের পর এই সুপ্রাচীন রাজস্ব ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ল। ইংরেজদের রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থায় গ্রামের পরিবর্তে ব্যক্তি হল একক। প্রত্যেক কৃষক ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব জমা দেওয়ার ব্যাপারে দায়ী হল সরকারের কাছে। আর রাজস্ব জমা দিতে হল নগদ অর্থে, উৎপাদিত শস্যে বা শস্য-মূল্যে নয়। ফলে একবার রাজস্ব নির্ধারিত হবার পর জমি আবাদ হোক বা পতিত হয়ে পড়ে থাকুক, সে ব্যাপারে সরকারের আর মাথাব্যথা রইল না এবং গ্রামের যৌথ মালিকানা একেবারে অবলুপ্ত হল। এই খাজনা আদায়ে যাতে কোনরকম শিথিলতা দেখা না দেয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজ সরকার নিষ্ঠুরতম ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতে লাগল।

গ্রামপ্রধানেরও ক্ষমতা এবং চরিত্রে পরিবর্তন এল। নির্ধারিত রাজস্বের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে সরকারের কাছে জমা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হল। নির্ধারিত রাজস্ব জমা দেওয়ার পরেও কৃষকদের কাছ থেকে যে-কোন পরিমাণ অর্থ আদায়ের ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হল। এই নতুন জমিদারদের জমি ক্রয়-বিক্রয়

এবং বণ্টন করারও ক্ষমতা দেওয়া হল। এঁদের এইসব কাজে সহায়তা করবার জন্য সমাজে নতুন এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হল। এইসব নতুন শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীর দল গরীব কৃষকের পরিশ্রমের ফসলের ওপর শুধু বেঁচে রইল না, তাদের অত্যাচার ও শোষণেরও পথ খুঁজে পেল। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ বণিকদের প্রলোভনের আগুন, যে আগুনে বাংলার চিরায়ত অর্থনৈতিক কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শুধু রাজস্ব-সংগ্রহের শোষণমূলক পদ্ধতিই নয়, বর্ধিত রাজস্বের পরিমাণও হল আকাশচুম্বী। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

উৎপাদিত শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাজস্ব দেওয়ার নিয়ম ধার্য হওয়ায়, কৃষকদের সামনে এগিয়ে এল আর এক জীবন-বিদারক অর্থনৈতিক সংকট। কৃষকদের হাতে নগদ অর্থ না থাকায়, তারা বাধ্য হত শস্য বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করত একশ্রেণীর অসাধু ইংরেজ বণিক। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে শস্য ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র খুলে গরীব চাষীদের বাধ্য করত কম দামে চাল বিক্রি করতে। বলা বাহুল্য, শস্যমূল্য অল্প হওয়ায় তাদের নিজেদের খোরাকির চালও অধিকাংশ সময়ে বিক্রি করে দিতে হত, রাজস্বের চাহিদা মেটাতে গিয়ে। আর সেইসব মৃত্যু-ব্যবসায়ীরা সেই শস্য গুদামজাত করে বর্ষাকালে প্রচুর মুনাফা রেখে বিক্রি করত সেইসব চাষীরই কাছে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ইউরোপীয় লেখকের মতে, ইংরেজ বণিকদের প্রভূত মুনাফা শিকারের উপায় হিসেবে প্রভূত পরিমাণে চাল কিনে গুদামজাত করবার কারণ, তারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তারা যে মূল্যই দাবি করুক না কেন, তা পেতে তাদের কোনই অসুবিধে হবে না।[৫] তাই যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করেও এ-দেশের কৃষক-সমাজ ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগল সমূহ ধ্বংসের পথে। এ ছাড়াও কৃষকদের আরও সর্বনাশের পথে নিয়ে গেল রাজস্ব আদায় পদ্ধতি। রায়তরা রাজস্বদানে অসমর্থ হলে

সিপাই পাঠিয়ে তা আদায় করা হত। ২৭ জানুয়ারি ১৭৭১ তারিখে, বিহার থেকে নায়েব-নাজিম রাজা সিতাব রায় জানাচ্ছেন : "জেলার রাজস্ব আদায়ে তিন ব্যাটেলিয়ান সিপাই নিযুক্ত করা হয়েছে।..."৬

কৃষকের রাজস্ব বাকি পড়লে তার জমি তুলে দেওয়া হত নিলামে। এই পথেই ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জমিকে করা হল বিনিময়ের বস্তু। যদিও রায়তের রাজস্ব বাকি পড়লে তার ওপর অত্যাচার হত চিরকালই, কিন্তু তবু পূর্বে কখনই তাকে জমিচ্যুত করা যেত না। কারণ সাধারণভাবে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা রায়তের থাকত না। মোগল যুগ পর্যন্ত ভূমির মালিকানা ছিল একমাত্র রাজার। এমনকি বিক্রয় অথবা নিষ্কর দান করার পরও ভূমির মূল মালিকানা-স্বত্ব রাজারই থেকে যেত, যা হস্তান্তরিত হত, তা কেবল দখলী অধিকার স্বত্ব। সুতরাং রায়তের কাছে ভূমি ছিল স্থায়ী এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু ইংরেজ আমলে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে জমি ক্রয়-বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়ার অধিকার সৃষ্টি হল। প্রয়োজনে রায়তরা এখন তার জমি বিক্রি বা বন্ধক রাখতে পারে। ফলে বর্ধিত রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হয়ে বহু রায়ত জমি বিক্রি করতে বাধ্য হল। আর সে-সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে এল মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনেরা। কৃষক-শোষণের এই মহোৎসবে দিনদিনই বাড়তে থাকল ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা।

শুধু কৃষক নয়—ইংরেজদের দেওয়ানিলাভ বাংলা ও বিহারের জনজীবনে তথা কারিগর, শিল্পী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষেরই জীবনে বয়ে এনেছিল বিষময় ফল। বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডের ছত্রচ্ছায়ায় এসে দাঁড়াল, তখন তারা বিকিকিনির হাটে নেমে ব্যবসায়ের নামে যে লুণ্ঠন-অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু করল—তাতে বাংলা ও বিহারের শিল্প-শ্রমিক শ্রেণী শুধুমাত্র বিপর্যস্তই নয়, একেবারে ধ্বংসের মুখে পড়ল। এদেশের রেশম ও সূতীবস্ত্রের শিল্পীদের নানা ধরনের চুক্তির নিগড়ে ফেলে সম্পূর্ণ পদানত করবার জন্য

চলত অকথ্য নির্যাতন। কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা প্রথম প্রথম এদেশের রেশম ও সূতীবস্ত্র য়ুরোপের বাজারে চালান দিয়ে প্রচুর মুনাফা লাভ করত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই লাভজনক ব্যবসায়ে একটা প্রবল অসুবিধে দেখা দিল। ইংলণ্ডের তাঁতশিল্পী ও বস্ত্রব্যবসায়ীরা বাংলার উন্নতমানের রেশমবস্ত্রের সঙ্গে অসম প্রতি-যোগিতায় পিছিয়ে পড়তে থাকায়, আন্দোলন দেখা দিল সেখানেও। এই সময় ইংলণ্ডে ভারতের রেশমশিল্প সম্পর্কে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তা নিম্নোক্ত কবিতাটিতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে :

"The silk-worms form the wardrobe's gaudy pride ;
How rich the vest which Indian looms provide ;
Yet let me hear the British Nymphs advise
To hide these foreign spoils from native eyes ·
Lest rival artists, murmuring for employ,
With savage rage the envied work destroy."[৭]

এরই ফলে পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের ডিরেক্টরবর্গ বাংলার প্রতি-নিধিদের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কড়া নির্দেশ দিয়ে ১৭।৩।১৭৬৯ তারিখে এক পত্র লিখলেন, যার মূল বক্তব্য হল : "তাঁরা যেন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে করে বাংলার শিল্পীরা আর রেশমবস্ত্র তৈরি করতে না পারে। তারা কেবলমাত্র কাঁচা রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেবেন। আর দেখবেন, রেশমগুটি থেকে যে-সকল কর্মী সুতো তৈরি করে, আর যারা সুতো থেকে বস্ত্র তৈরি করে—এই উভয় শ্রেণীর কর্মীই যেন ঘরে বসে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে। সেজন্য এদের কোম্পানির কারখানায় কাজ করার জন্য বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে রাজনৈতিক ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে হবে। যার সোজা অর্থ সামরিক শক্তির প্রয়োগ, জুলুম, অত্যাচার ইত্যাদিও কার্যসিদ্ধির জন্য অবাধে চালাতে হবে। এককথায় রেশমবস্ত্র তৈরি না করে ত

বাধ্য করা এবং রেশম উৎপাদনে উৎসাহদান করতে হবে যে-কোন উপায়ে।"[৮]

এই নীতির ফলে রেশমবস্ত্রের তাঁতীদের একটা বড় অংশ স্থায়ী বেকারে পরিণত হয় এবং জীবনধারণের জন্য কেবলমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। যদিও সেখানেও তখন কায়ক্লেশে দিনযাপনের দিনও গতপ্রায়।

আমরা পূর্ববর্তী ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অধ্যায়ে দেখেছি একবছরের খরার সঙ্গে যদি ইংরেজ বণিকদের পর্বতপ্রমাণ লাভের আশায় খাদ্য-মজুত নীতি গৃহীত না হত, তবে মন্বন্তর এমন ভয়াবহ রূপ নিত কিনা সন্দেহ। সেই দুর্যোগের দিনগুলিতে সুপারভাইজাররা খাজনা আদায়ে কোন্ ধরনের বাহাদুরি দেখিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় এর বর্ধিত পরিমাণের অন্তরালে কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তাও আমরা লক্ষ্য করেছি। আর এর জন্য বাংলার মানুষ যে বিভীষিকা ও মর্মযন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটিয়েছে, তাও নজিরবিহীন।

কোম্পানির নির্দয় নীতিতেই শ্রমিক-শিল্পীর রুজি-রোজগার বন্ধ হল—টান পড়ল কৃষকের পেটের অন্নে। কৃষক সারাবছর রোদে-জলে চাষ করল কিন্তু ফসল ঘরে তুলতে পারল না। তা মজুত হল কোম্পানির ভাণ্ডারে। অন্নাভাবে দিন কাটতে লাগল শিল্পী-কৃষক-শ্রমিকদের। কোম্পানির শাসন ও শোষণ নীতির দ্বিমুখী অভিযানে এদেশীয়দের হাতে ও ভাতে মারার ব্যবস্থা পাকা হল। গ্রাম্য অর্থনীতির এই বিপর্যয় দরিদ্র মানুষগুলিকে নিঃস্ব করে তুলল অচিরেই। বাংলার গ্রামজীবনের অরক্ষিত গৃহপ্রাঙ্গণে বৃটিশ শক্তির এই হঠাৎ প্রবেশ যাদের সর্বহারা করে তুলল, তাদের যখন আর হারাবার মতো কিছুই অবশিষ্ট রইল না তখন তারা মুক্তির পথ খুঁজে নিল সংঘর্ষ-সংঘাতের পথে। সকলেই কিছু অদৃষ্টবাদী ছিল না। তাই নীরবে মরার আগে একবার শেষ চেষ্টা করল। তারা সোজা হয়ে রুখে দাঁড়াল। তাদের অত্যাচারীকে তারা শুধু শত্রু মনে করেই ক্ষান্ত রইল

না ; বাধ্য হল বিদ্রোহ করতে। এই বিদ্রোহই রূপ গ্রহণ করল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অস্ত্রধারণের মধ্যে দিয়ে। যেহেতু সন্ন্যাসী ও ফকিররা নেতৃত্ব দিয়েছিল এই বিদ্রোহে, তাই এর নাম সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। ক্ষুধাতাড়িত মুসলমান রায়তরা অনেকেই যোগ দিল ফকিরদের সঙ্গে। হিন্দুরা যোগ দিল সন্ন্যাসীদের দলে। উভয় দলই রাজনৈতিক পালাবদলের সময় একযোগে বাংলার বুকে সৃষ্টি করে চলল অরাজকতা, লুণ্ঠন ও ত্রাস।

এদেশের কৃষক তথা শ্রমজীবী মানুষের ধৈর্য ও সহনশীলতা অপরিসীম, সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনও কখনও নিষ্ঠুর শাসন-শোষণ সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদেরও সহ্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে। তখন তারা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই রুখে দাঁড়ায় সমবেতভাবে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে। আঘাতের বিরুদ্ধে করে প্রত্যাঘাত। কারণ তারা তো জগদ্দলপাথরের মতো প্রাণাবেগ-বর্জিত, স্থবিরতা-প্রাপ্ত, পরিবর্তনবিমুখ এক হিমশীতল জড়পিণ্ডমাত্র নয়। তারাও যে মানুষ। সেই সেদিনকার মনুষ্যত্বের মুখর ঘোষণারই আর এক নাম সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ।

শুরু হয়েছিল খুব সাধারণভাবেই। খাজনা দিতে অপারগ কৃষক-রায়তদের আবেদন-নিবেদন, আর্জিপত্র দিয়ে। বিভিন্ন জেলায় বিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রজারা কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জিপত্র পাঠায়। অভাব-অভিযোগ জানিয়ে তার প্রতিকার প্রার্থনা করে। প্রার্থনা ব্যর্থ হল। তারা সদরে জমায়েত হতে থাকে। শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে। সরকারি অফিস ঘেরাও করে। কাজকর্মে অচলাবস্থা আনে। সোচ্চার হয় দাবি আদায়ে। প্রথমে খাজনা-বন্ধের আন্দোলন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে বীরভূমের জেলা-কালেক্টর জানান : রায়তরা শুধু কমিটি অফ রেভিনিউর কাছে অভিযোগপত্র পাঠায়নি, তারা তাদের জমি ছেড়ে ভিন্ন জেলায় চলেও গেছে কেউ কেউ। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি রেভিনিউ বোর্ডকে আবার জানান : অঘ্রান ও পৌষ মাসে কৃষকরা সমগ্রভাবে জমায়েত হয়। ইজারাদারদের সঙ্গে আপস-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত

খাজনা আদায় বন্ধ করে দেওয়া রায়ত-কৃষকদের মধ্যে প্রায় একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে।[৯] ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার তিনি জানান : প্রায় সমগ্র জেলা জমাবন্দীর বিরোধিতা করতে সশস্ত্র হয়ে আছে।[১০]

এর বীজ রোপিত হয়েছিল অনেক আগেই। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ২ জুন তারিখে মহম্মদ রেজা খাঁ এক পত্রে গভর্নরকে জানাচ্ছেন যে, চলতি বছরের বন্দোবস্ত এখনই হওয়া দরকার। কিন্তু সে ব্যাপারে জমিদার বা চাষীদের সঙ্গে বন্দোবস্তের শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁরা সরাসরি উত্তর দেন যে, জেলার ওপর তাঁদের কোন ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ নেই, সুতরাং তাঁরা বন্দোবস্তের শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না।[১১] এর কারণ আর কিছুই না। বাড়তি রাজস্ব না কমালে কেউ চাষের চুক্তিতে আসতে রাজি নয়।

প্রাথমিক এই খাজনা-বন্ধের আন্দোলনই পরে দ্রুত পরিণত হয় খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে। শুরু হয় জমি দখল, আদায়ী খাজনা ও সরকারি ধনভাণ্ডার লুঠপাট। তারা হানা দেয় বিভিন্ন শহরে গঞ্জে। লক্ষ্য, কোম্পানির কুঠিবাড়িগুলি আর জমিদার-জোতদারদের শস্যগোলা। ১৭৮৮ সালের অক্টোবর মাসে বীরভূম থেকে আদায়ীকৃত সরকারি রাজস্ব লুঠের খবর পাওয়া যায়।[১২] ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর এক জরুরী বার্তায় জানালেন ঃ "মুর্শিদাবাদের পশ্চিম সীমানা বরাবর দলে দলে সশস্ত্র ডাকাত এসে জড় হচ্ছে। অজয়ের পাড়ে গভীর জঙ্গলে তাদের ঘাঁটি। তারা সংখ্যায় চারশোর কাছাকাছি। সুযোগ পেলেই এইসব ডাকাতের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে গ্রাম-জনপদের ওপর। লুঠপাট করে তাদের সর্বস্বান্ত করে চলে যাচ্ছে। লুঠে নিচ্ছে সরকারি কুঠি।..." এদের অস্ত্র বলতে তীরধনুক, টাঙ্গি-বর্শা, ঢাল-তলোয়ার থেকে দেশী গাদা বন্দুক। এই-ভাবে এক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ অচিরেই রূপ নেয় সশস্ত্র বিক্ষোভের। গণ-অসন্তোষের উর্বর ভূমিতে জন্ম হয় গণ-বিদ্রোহের।

সরকারি পরিভাষায় এরা নিছক 'ডাকাত', 'লুঠেরা', 'বর্বর', 'পাহাড়িয়া' ইত্যাদি। কিন্তু এদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রবল সংখ্যা-বৃদ্ধি সরকারি চরিত্রায়ণের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। এ প্রসঙ্গে বীরভূম জেলার কালেক্টরের কাছে প্রেরিত ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২১ মে তারিখের প্রস্তাবটির অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এখানে উল্লেখ করা হল :

"...কোথাও যদি কখনও উত্তেজিত রায়তরা জমায়েত হয়ে কোন-রকম হৈ-হল্লা করে, কালেক্টর তৎক্ষণাৎ তাদের অভিযোগগুলি শুনে তদন্তের আশ্বাস দেবেন। এবং কালেক্টর সেই ব্যাপারে সরেজমিনে তদন্ত করতে নিজে যাবেন। অপারগ হলে সহকারীকে পাঠাবেন। এতেও যদি উত্তেজিত জনতা শান্ত না হয়, তবে কালেক্টর তখন তাদের এইধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের বা সরকার-বিরোধী কার্য-কলাপে যুক্ত থাকার পরিণতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। তাতেও যদি কাজ না হয়, অর্থাৎ তারা সরকারি আদেশ মানতে অস্বীকার করে, তখন তিনি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের দল-পতিকে গ্রেপ্তার করবেন। তবে সর্বদাই তাঁকে ধৈর্য ও সংযম রক্ষা করে চলতে হবে, যাতে করে রক্তপাত এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়। আর ধৃত ব্যক্তিদের ডাকাতি ও বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচারের জন্য চালান দিতে হবে ফৌজদারি আদালতে...।"[১৩]

সরকারি পরিভাষায় কৃষক-রায়ত বিদ্রোহীদের ডাকাতে পরিণত হওয়ার কারণের এই হল মূল রহস্য। সরকারই সর্বপ্রথম এদের 'ডাকাত' আখ্যা দেয়। সেইসঙ্গে বিদ্রোহী বলেও অভিহিত করা হয়েছে এদের, এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

এই ঐতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহ সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নামে পরিচিত হল কেন, আর কৃষকদের এই বিদ্রোহের সঙ্গে সন্ন্যাসীরা কি করেই বা যুক্ত হলেন—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। যদিও এ-সম্পর্কে সঠিক তথ্য তেমন পাওয়া যায় না। তবে তৎকালীন শাসকদের চিঠিপত্রে এই

বিদ্রোহকে সন্ন্যাসীদের আক্রমণ বলে উল্লেখিত হতে দেখা যায়। এছাড়া 'Calendar of Persian Correspondence' ও 'Siyar-ul-Mutakharin' নামক ঘটনাপঞ্জী আকারে লিখিত গ্রন্থ দু'টিতে দেখা যায়, সেই সময় ভারতে মারাঠা সম্প্রদায়ভুক্ত 'গোসাঁই', শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত নাগা, ভোজপুরী এবং 'মাদারী' সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন দলের ফকিরগণ দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এরাই যে ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে দীর্ঘকালব্যাপী বাংলা ও বিহারের ওপর আক্রমণ চালিয়ে লুণ্ঠন করত, এমন কথার উল্লেখ কোথাও নেই। তবে মোগল শাসনের মধ্য ও শেষ পর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিজমা দখল করে অথবা দান হিসেবে গ্রহণ করে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে সেইসব গৃহী-সন্ন্যাসী ও ফকিররা চাষবাস শুরু করে রীতিমতো কৃষকে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, ময়মনসিংহের কয়েকজন জমিদারের ইংরেজ সরকারের কাছে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়ঃ "বিহারের বিশৃঙ্খলাকারী সন্ন্যাসীরাই সেখানে বসবাস শুরু করেছে। তারা সেখানে মহাজনি কারবার, ধান্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্যও আরম্ভ করেছে। এর জন্য মৃগীনদীর ওপর লালাগঞ্জে একটি হাটও স্থাপন করেছে।"[১৪]

সুতরাং এই ১৭৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দে যেখানে সন্ন্যাসীরা রীতিমতো বসবাস করছে বলে উল্লিখিত পত্রে জানা যাচ্ছে, সেখানে ধরে নেওয়া যায় যে তাদের আগমন হয়েছিল এর বেশ কিছু বছর পূর্বে। কারণ কোন একটি দলের পক্ষে মহাজনি কারবার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের শুরু অথবা হাট স্থাপন—সেখানে তাদের বসবাসের নিশ্চয়তালাভের বেশকিছু পরেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু গৃহী-সন্ন্যাসীতে পরিণত হলেও, একদিকে যেমন তারা সন্ন্যাসী-ফকিরের পোশাক পরত, অন্যদিকে তেমনি চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বছরের বিভিন্ন সময়ে বা পাল-পার্বণে দলবদ্ধভাবে তীর্থভ্রমণেও যাত্রা করত। বাংলায় বসবাসকারী এইসব

সন্ন্যাসীরা প্রধানত গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। আর ফকিররা ছিল মূলত মাদারী সম্প্রদায়ের। উত্তরবঙ্গে এদের অনেক দরগা ও তীর্থক্ষেত্র থাকায় সেখানেই এদের জমায়েত ছিল বেশি। ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকেই কৃষক হিসেবে যেমন এরা সরকারের শোষণের শিকার হয়ে ওঠে, আবার ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে এদের তীর্থযাত্রার পথে নানান ধরনের কর বসিয়ে মুনাফা তুলতে চাওয়ায়, সেদিক থেকেও এরা ইংরেজ সরকারের শোষণ ও উৎপীড়নের শামিল হয়ে পড়ে। এ ছাড়া সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা প্রথা অনুসারে তীর্থযাত্রার পথের দু'পাশের গ্রামবাসীর কাছ থেকে এরা দানও সংগ্রহ করত। দ্বৈত শাসনের পরে রায়তদের অবস্থার অবনতি ঘটায় এই সন্ন্যাসীদের দাবি মেটাতে গিয়ে রাজস্বে টান পড়তে লাগল। ফলে, সন্ন্যাসীদের এই দাবি ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দেয়। সন্ন্যাসীরা একে তাদের অধিকারের ওপর বে-আইনি হস্তক্ষেপ মনে করে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ইংরেজরা এদেশের লৌকিক প্রথায় অযথা হস্তক্ষেপ তথা বাধা সৃষ্টি করছে নিজেদের স্বার্থে —এই ধরনের একটা রাজনৈতিক চিন্তাও সেখানে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে উঠল অনিবার্য। তখন বিদ্রোহী হওয়া ছাড়া এদেরও ধর্মরক্ষা ও প্রাণরক্ষার আর কোন পথ থাকে না। বাংলা ও বিহারের কৃষক-বিদ্রোহে এদের অংশগ্রহণ এবং সেইসঙ্গে দলবদ্ধভাবে তীর্থভ্রমণের কারণেই তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই কৃষক-বিদ্রোহকে 'বহিরাগত ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ও দস্যু কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণ' নামে অভিহিত করেন। বস্তুত হেস্টিংসই সর্বপ্রথম এই কৃষক-বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নামে আখ্যায়িত করেন।

এদেশের সন্ন্যাসীরা আবহমান কাল ধরেই সাধারণ মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করত। মুসলমান আমলে সন্ন্যাসীদের কখনও কখনও সনদ দেওয়া হত। বিশেষ করে তারা যখন তীর্থযাত্রায় যেত। কিন্তু জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের আমল থেকেই তাঁর মূল শিষ্যগণ যেমন অস্ত্র-

ধারণ করত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে, তেমনি পরবর্তী পাঠান ও মোগল আমলেও কিছু কিছু সন্ন্যাসী ছিল যারা কখনই অস্ত্র ত্যাগ করেনি। এদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। সম্ভবত এই কারণেই 'দবিস্তানে'র লেখক মন্তব্য করেছেন, "The Sanyasis being frequently engaged in war."[১৫]

নাগা সন্ন্যাসীরা আবার অন্যান্য হিন্দু সন্ন্যাসীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তারা শুধু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বহন করত না, তাদের যথেচ্ছ ব্যবহারও করত। আর পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত ভারতীয় জমিদাররা ও রাজপুরুষেরা এদের পোষণ করতেন ভাড়াটিয়া গুণ্ডা হিসেবে। একটি পত্রে ময়মনসিংহের জমিদারদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "...পূর্বে একটি প্রথা ছিল, জমিদারগণ স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন সুরক্ষার প্রয়োজনে তাঁদের পরগনাতে সন্ন্যাসীদের থাকার ব্যবস্থা করতেন।"...[১৬]

পত্রটি খুবই ইঙ্গিতবহ। কোম্পানির নথিপত্র থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় যে, জমিদাররা অধিকাংশ সময়েই এইসব সন্ন্যাসীদের, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনে পাইক, বরকন্দাজ এবং সীমান্ত প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করতেন। আর এইসব সন্ন্যাসীরা কেবলমাত্র জমিদারদের শক্তিবৃদ্ধিতে সহযোগিতা করেনি, আশ্রয়দাতা জমিদারকে স্থানীয় অপর জমিদারের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসায় কিংবা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে। নবাব আলিবর্দির সময়ে উড়িষ্যার শাসনকর্তা দুর্লভরাম সন্ন্যাসী ও ফকিরদের প্রতি বিশেষ দুর্বল ছিলেন, অর্থাৎ এদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিলেন তিনি। শোনা যায় জয়পুরের মহারাজার অধীনেও ছিল প্রায় দশহাজার নাগা সৈন্য। আবার কেউ কেউ বলেন, মসনদচ্যুত নবাব মীরকাশিম মসনদ ফিরে পেতে এই সন্ন্যাসীদেরই সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন : যদিও এ-সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই। তবে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌল্লা, পাটনার শাসনকর্তা রাজা বেণী বাহাদুর—এঁরা দু'জনেই যে সন্ন্যাসী নেতা হিম্মত গিরির সহযোগিতা সম্বল করে পাটনার নিকটবর্তী মেজর

কারনাকের ঘাঁটির ওপর আক্রমণে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের অভাব নেই। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ মে তারিখে হুগলির ফৌজদার সৈয়দ বদল খাঁকে লেখা এক পত্রে এর বিস্তারিত বিবরণ মেলে।[১৭] এইসব সন্ন্যাসীরা যে বেতনভোগী সৈন্য হিসেবে কাজ করেছে তারও নজির আছে।[১৮] সন্দেহ নেই, অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতায়, হয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য, নয়তো ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জয়ী হবার আশায়, ভারতীয় রাজারা সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ব্যবহার করতেন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এই একই পথে মারাঠা ও রাজপুত বাহিনীতেও এরা যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

মোগল আমলে উত্তর ভারতে বহু অস্ত্রধারী সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল ছিল। তারা রাজা-জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সৈন্যদলে ও বরকন্দাজ দলে যোগদান করত জীবিকা হিসেবে। এ ছাড়া পৃথকভাবে লুঠপাটও করত। যদিও অনেকক্ষেত্রে তারা মন্দির, মসজিদ ও পীরের দরগা স্থাপন করেছিল, তবু ধর্মপ্রচারের সঙ্গে এইসব সন্ন্যাসী-ফকিরদের তেমন কোন সম্বন্ধ ছিল না। এগুলি তারা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করত মাত্র। তাদের পেশা ছিল ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা। জবরদখল নীতি অনুসরণ করে অনেক ক্ষেত্রে তারা ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা-জমিদারদের নিকট থেকে সনদও পেত।

মন্বন্তরের সময় থেকে লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী ও ফকিদের দল ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। উত্তর ভারতের এবং বাংলার বহু সৈনিক ও বরকন্দাজ কর্মচ্যুত হয়ে জীবিকার সন্ধানে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। মন্বন্তরের ফলে যাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছিল তেমন অনেক কৃষকও লুণ্ঠনকারীদের দলভুক্ত হয়। কোন কোন জমিদার সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সাহায্য করতেন লুঠের অংশ পাবার লোভে।

অবাঙালি সন্ন্যাসী ও ফকির, কর্মচ্যুত সৈনিক ও বরকন্দাজ, ভূমি-

হারা কৃষক, কর্মহীন কারিগর এইসব বিচিত্র মনুষ্যগোষ্ঠীর একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল লুণ্ঠনের সাহায্যে জীবিকা অর্জন। এদের মদত দিত লোভী জমিদারের দল। এদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধনী জমিদারদের বাড়ি ও কাছারি, ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি এবং হাটবাজার—যেখানে নগদ টাকা এবং সঞ্চিত পণ্যদ্রব্য পাওয়া যেত সহজে। ইংরেজদের কাগজপত্রেএদের 'দস্যু' (lawless banditti) বলা হয়েছে ; কোথাও বিদ্রোহী (rebel) বলা হয়নি। কোন কোন ঐতিহাসিক একে কৃষক-বিদ্রোহ আখ্যা দিতে অস্বীকার করেছেন। তবে, এ কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের দল ডাকাতি করত এবং অনেক সময়েই তারা আঞ্চলিক ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এর বড় প্রমাণ এই যে, যে-সব জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেশি হয়েছিল সেইসব জেলায় ডাকাতির উৎপাতও ছিল বেশি, অপরপক্ষে যে-সব জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অল্প ছিল সে-সব জেলায় ডাকাতিও কম ছিল।

দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লুঠপাট হয়েছিল বীরভূম জেলায়। ডাকাতদের বড় বড় দল, দুই-তিন শত লোক নিয়ে প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যাচার করত। ছোটনাগপুরের জঙ্গল অঞ্চল থেকে এসে আদিবাসী চুয়াড়েরা বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও বীরভূমে লুঠপাট করত।

হুগলি জেলায় ডাকাতদের উৎপাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম হয়। অনেক সময়েই যে-সব অঞ্চলে তারা যাতায়াত করত সেখানে তারা খাজনা আদায় করত। কারণ ছোটখাট একদল সিপাহীর সম্মুখীন হবার মতো শক্তি তাদের ছিল।

উত্তরবাংলার জেলাগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল নানা কারণে। সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তরবাংলায়।

কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার দর্পদেব ভুটিয়া-দের সাহায্য নিয়ে রংপুর, দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়া জেলা বিধ্বস্ত

করতেন। মালদহ ও রাজমহলেও ডাকাতদের বড় ঘাঁটি ছিল।

মন্বন্তরের ঠিক পরেই, অর্থাৎ ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস রাজস্বসংক্রান্ত প্রশাসনের সদর দপ্তর মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তরিত করে কলকাতায় নিয়ে এলেন। নবাবী আমলে রাজধানী মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে উত্তরবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে টাকাকড়ির লেনদেন চলত। এতে বহু মানুষের আর্থিক সংস্থান হত। রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার ফলে উত্তরবাংলার মানুষ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হল। এইসব বঞ্চিত তথা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ডাকাতিকেই পেশা হিসেবে আঁকড়ে ধরেছিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাষায় এইসব সন্ন্যাসী-ফকিররা হল: 'হিন্দুস্তানের যাযাবর', 'পেশাদারি ডাকাত,' এবং তীর্থযাত্রার নামে 'ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি ও লুণ্ঠনে অভ্যস্ত দস্যু'।

একটি পত্রে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: "They are robbers by profession and even by birth."[১৯]

এই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের পরিচয় প্রসঙ্গে কলকাতা কাউন্সিল এক পত্রে লিখলেন, "...A set of lawless banditti, known under the name of Sannyas's or Faquirs, have long infested those countries; and under pretence of religious pilgrimage, have been accustomed to traverse the chief part of Bengal, begging, stealing, and plundering wherever they go, and as it best suits their convenience to practise....."[১০]

অপর একটি পত্রে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরের বাংলার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "...their (সন্ন্যাসী ও ফকির) ranks were swollen by a crowd of starving peasants who had neither seed nor implements to recommence cultivation with, and the cold weather of 1772 brought them down

upon the harvest fields of lower Bengal, burning, plundering, ravaging 'in bodies of fifty thousand men'."[২১]

সুতরাং সরকারি নথিপত্র থেকে বিদ্রোহীদের কতকগুলি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ঃ

১. হিন্দুস্থানের যাযাবর।

২. এরা জন্মসূত্রেই চোর বা ডাকাত।

৩. পেশা ভিক্ষাবৃত্তি।

৪. অবস্থা সহায়সম্বলহীন।

৫. অন্নাভাবে অনাহারে এদের দিন কাটাতে হত।

৬. চাষের জমি ও যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হওয়ায় চাষাবাদের সুযোগ হারিয়েছিল।

৭. দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরগুলিতে এদের সংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি হয়েছিল।

এইসব বিদ্রোহীদের তৎপরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রংপুর অঞ্চলে। পূর্ববর্তী অধ্যায়েই লক্ষ্য করা গেছে যে, মন্বন্তরের ভয়াবহ প্রভাব পূর্ণিয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান দিনাজপুরে যতটা পড়েছিল, তার অনেক কম পড়েছিল পার্শ্ববর্তী রংপুর অঞ্চলে। এর ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় উপদ্রুত এলাকার গ্রামবাসী এখানে এসে সমবেত হয়েছে বাঁচার তাগিদে। এদের মধ্যে সর্বহারা গৃহী যেমন ছিল, তেমনি ছিল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও। আবার অনন্যোপায় হৃতসর্বস্ব গৃহস্থরাও অনেকেই ভেক নিলে ভিক্ষা মেলবার আশায়—ভিক্ষাকেই জীবিকার ভরসা করে সন্ন্যাসী-ফকিরদের ভেক গ্রহণ করেছিল।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যিনি নায়ক, যিনি 'কয়েক হাজার সর্বহারা মানুষকে নিজের দলভুক্ত করে বিদ্রোহের দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিটির নাম ছিল মজনু শাহ্। এঁর

সম্পর্কে জনৈক লেখক বলেছেন, "The role of Majnushah is particularly significant. He was an organiser of great ability, a great commander-in-chief who fought in the midst of a very trying situation against the superior armed forces of the British."[২২]

১২২০ সালে জনৈক পঞ্চানন দাস কর্তৃক রচিত 'মজনুর কবিতা' নামে একটি গাথার সন্ধান পাওয়া যায়। এর পটভূমিকা—ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। এতে মজনু শাহ্‌র বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, রাজকীয় চালচলন ও শক্তিমান যোদ্ধার চরিত্রটি ফুটে উঠেছে :

"শুন সভে একভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বারনা॥
কালান্তক যম বেটাক্ কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥
সাহেব স্নভার মত চলন্ স্নঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডাবান ঝাউল নিশান॥
উঠ্ গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি॥
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥
দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধূম॥
বড়ই দুখ্খিত হৈল পলাইব কোথা।
মন দিয়া শুন সভে লোকের অবস্থা॥
যেদিন যেখানে যায়্যা করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া॥
সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুয়া।
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া॥

ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
পাছুয়া বেপারী পলায় গাছে ছাড়্যা গুড়॥
নারীলোক না বান্ধে চুল না পরে কাপড়।
সর্বস্ব ঘরে থুয়্যা পাথারে দেয় নড়॥
হালুয়া ছাড়িয়া পলায় লাঙ্গল জোয়াল।
পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওয়াল॥
বড় মনুষ্যের নারী পলায় সঙ্গে লয়্যা দাসী।
জটার মধ্যে ধন লয়্যা পলায় সন্ন্যাসী॥[২৩]

মজনুর কার্যকলাপে উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় ইংরেজরা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। সমগ্র বাহিনীর সাহায্যেও তাঁকে দমন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

বাংলায় এই বিদ্রোহে যাঁরা নেতৃত্ব দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী। এঁরা দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে মজনু শাহ্‌র মৃত্যুর পর থেকে বাংলার বিদ্রোহের নায়ক ও নায়িকা হিসেবে এই দু'জনের নাম শোনা যেতে থাকে। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ী ঢাকার সরকারী কাস্টম্‌স্-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কাছে অভিযোগ করে যে, "ভবানী পাঠক নামে এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি পথে তাদের পণ্যবাহী নৌকা লুঠ করে নিয়েছে।"[২৪]

ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানীর সহযোগিতায় একদল বিদ্রোহী সেনা নিয়ে প্রায়ই ইংরেজ ও বিদেশী বণিকদের নৌকা লুঠপাট করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। এই দুঃসাহসী ব্যক্তিটির সম্পর্কে যদিও বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবু ইংরেজ কর্মচারী ও সেনানায়কদের পত্রাবলীতে এবং গ্লেজিয়ার সাহেবের লেখা রংপুর জেলার বিবরণে[২৫] ভবানী পাঠক সম্পর্কে যে সামান্য উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্য দিয়েই বিদ্রোহী নায়কের গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবন-পরিচয় ফুটে উঠেছে। গ্লেজিয়ারের মতে: রংপুর জেলার বাজপুর নামক জায়গার

অধিবাসী ভবানী পাঠক, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা-পর্ব থেকেই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্তী এক গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে বিদ্রোহ সংগঠন ও পরিচালনে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর দলের মধ্যে বহু পাঠানও ছিল। পাঠকের বাহিনীর প্রধান সেনাপতিও ছিলেন একজন পাঠান।[২৬] অবশেষে লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সৈন্যদল পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। একদিন পাঠক তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুচর সমেত ইংরেজ বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এক ভীষণ জলযুদ্ধের পরে পাঠকের দল পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ভবানী পাঠক, তাঁর প্রধান সহকারী পাঠান সেনাপতি ও অন্য দু'জন সহকারী নিহত হন। আটজন আহত সহ বাকি পঞ্চাশজন ইংরেজের হাতে বন্দী হয়। এছাড়া অস্ত্রসম্ভারে পরিপূর্ণ সাতখানি নৌকা ইংরেজদের হস্তগত হয়।[২৭] সম্ভবত এই সময় পাঠকের সঙ্গে দেবী চৌধুরানী ছিলেন না। কারণ পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী চৌধুরানীর আক্রমণে যে শাসকগণ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তার নজির ইংরেজ সরকারের নথিপত্রে পাওয়া যায়।[২৮] এই ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে মজনু শাহ্‌রও যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। আর ইংরেজদের নথিপত্রে এঁদের 'ডাকাত' বলা হয়েছে। লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনানের রিপোর্ট থেকেই গ্লেজিয়ার সাহেব দেবী চৌধুরানীর সন্ধান পেয়েছিলেন।

"... we just catch a glimpse from the lieutenant's report of a female dacoit by name Devi Choudhuranee also in league with Pattak who lived in boats, had a large force of Burkandazes in her pay and committed dacoities on her own account besides getting a share of the booty obtained by Pattak."[২৯]

এই দেবী চৌধুরানীকে গ্লেজিয়ার সাহেব একজন জমিদার বলে

উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত 'চৌধুরানী' শব্দটিই তাঁর এই অনুমানের কারণ। দেবী সব সময় নৌকায় লুকিয়ে থাকতেন বলেই তিনি অনুমান করেছেন, দেবী হয়তো সময়মতো রাজস্ব জমা দিতে না পেরে পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহী কৃষকদের পরিচালিকারূপে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।[৩০]

লেঃ ব্রেনান এই মহিলা ডাকাতকে ধরবার অনুমতি চেয়ে রংপুরের কালেক্টরকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার উত্তরে কালেক্টর সাহেব লেখেন, "...I cannot at present give you any orders, with respect the female Dacoite, mentioned in your letter--If on examination of the Bengal papers, which you have sent it shall appear that there are sufficient grounds for apprehending her, and if she shall be found within the limits of my jurisdiction, I shall hereafter send you such orders as may be necessary."[৩১]

দেবী চৌধুরানীর শেষ পরিণতি কি হল, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই বিদ্রোহীদের দলে আরও কয়েকজন নামকরা নায়ক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দর্পদেবের কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া মজনু শাহ্‌র ভাই মুসা শাহ্‌, রামানন্দ গোঁসাই, কৃপানাথ, ইমামবাড়ী শাহ্‌, সোভান আলি প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

এই কৃষক-বিদ্রোহ তথা সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আগে ও পরে। মন্বন্তরের আগে যে বিদ্রোহ তার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অথবা শুধুমাত্র লুণ্ঠনের প্রবৃত্তিই প্রধানত কার্যকরী ছিল বলে মনে হয়।

বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে এই বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয় মন্বন্তরের কয়েক বছর আগে। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২১ ও ২৫ ফেব্রুয়ারির এক

আলোচনা সভায় এবং ওয়াট সাহেবের রিপোর্টে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরে নাগা সন্ন্যাসী ও মারাঠাদের লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া যায়। বর্ধমান ও কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এসে তিনি জানিয়েছিলেন যে, ঐসব অঞ্চলে নাগা সন্ন্যাসীদের লুণ্ঠনের ফলে তাঁরা রাজস্ব আদায়ের কাজ বন্ধ রেখেই পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন কলকাতায়। এর ফলে সর্বসম্মতি-ক্রমে এক প্রস্তাবে স্থির হয়, রাজস্ব আদায়ের কাজ অব্যাহত রাখবার জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে।[৩২]

এই নাগা সন্ন্যাসীরা ছিল মারাঠাদের ভাড়াটিয়া সৈন্য। মারাঠাদের প্ররোচনাতেই তারা বাংলায় প্রবেশ ও লুণ্ঠন কাজ চালিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কারণ বাংলার সম্পদ, পথঘাট ও সেইসঙ্গে রাজনৈতিক দুর্বলতা সম্পর্কে মারাঠারা তখন যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরে লুণ্ঠন, ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠি লুঠ, ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে পাঁচ হাজার সন্ন্যাসীর এক দলের বিহারের সারন জেলায় প্রবেশ ও সেখানকার ইংরেজ সিপাইদের সঙ্গে সংঘর্ষ, ইত্যাদি ঘটনার পিছনে দেশের বুভুক্ষু অসহায় মানুষগুলির বাঁচার তাগিদ যতটা ছিল, তার থেকে অন্য কারণ-গুলি হয়তো অধিক সক্রিয় ছিল। এরপর ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী, রংপুর, পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের লুণ্ঠন ও তৎপরতাকে আমরা মন্বন্তরজনিত বা ক্ষুধার্ত মানুষের প্রাণরক্ষার সংগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

মন্বন্তরের পরবর্তী যে বিদ্রোহ হয়েছিল, তার অর্থনৈতিক কারণ অনুমান করতে অসুবিধে হবার কোন কারণ নেই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক বিরাট সংখ্যক মানুষের শুধু মৃত্যুই হয়নি, যারা বেঁচেছিল তাদেরও বেঁচে থাকাটাই হয়ে উঠেছিল চরম অভিশাপ। ক্ষুধাতাড়িত হতভাগ্য কিছু মানুষ বাঁচার আর কোন পথ না পেয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবেই জমিদার ও সরকারের সংগৃহীত খাজনা লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করল। সন্ন্যাসীদের শক্তির মূলে ছিল এইসব স্থানীয়

শ্রমজীবী মানুষেরা। তা না হলে ইংরেজ শাসনে করায়ত্ত বাংলা ও বিহারের দুর্দিনেই বিদ্রোহীদের বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটত না। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার খুব স্পষ্টভাষায় এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে 'কৃষক-বিদ্রোহ' বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এইসব বিদ্রোহীরা হল : মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বসে পড়া সেনাবাহিনীর কর্মহীন বুভুক্ষু সেনার দল আর জমিহারা, গৃহহারা, স্বজনহারা হতভাগ্য কৃষকের দল। এরাই তথাকথিত গৃহত্যাগী (গৃহচ্যুত), সর্বত্যাগী (সর্বস্বান্ত) সন্ন্যাসীর দল।[৩৩] হাণ্টারের মতোই অপর একজন সরকারি ইতিহাস ও গেজেটিয়ার রচয়িতা ও'ম্যালির বক্তব্যও হাণ্টারেরই অনুরূপ।[৩৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাথমিকভাবে কৃষক ও কারিগরদের এই সংগ্রাম অবিলম্বে সমাজের অন্য দু'টি স্তরকেও আকর্ষণ করেছিল। এদের একটি হল মোগল বাহিনীর কর্মচ্যুত সৈন্যদল এবং অপরটি হল বিহার ও বাংলায় স্থায়িভাবে বসবাসকারী সন্ন্যাসী ও ফকির চাষীদের দল। প্রধানত দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত হত মোগল সৈন্যবাহিনী। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করার জন্য এরা একটা বিশেষ শ্রেণীতেই পরিণত হয়েছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এরাও কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে এদের জীবিকার সম্বল নিষ্কর জমিগুলি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয়। কর্মচ্যুত, উৎখাত মানুষগুলি জেলাময় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘুরে বেড়ায় নতুন জীবিকার সন্ধানে। এদের খুব সামান্য অংশ আবার সিকদার বা ইজারাদারদের অধীনে কাজ পায়। বেশিরভাগই কৃষি-শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগতে চায়।

কিন্তু তখন আর তাদের স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে ফেরার পথ ছিল না। কারণ সমাজের সব ক্ষেত্রের ভাঙন তখন এত ব্যাপক ও গভীর যে, নতুন করে কিছু গড়ে তোলার বা সহজ পথে এদের গ্রহণ করবার শক্তি তখন সমাজের ছিল না। সুতরাং একমাত্র লুণ্ঠন-চুরি-ডাকাতি ছাড়া এদের আর বাঁচার সব পথ বন্ধ ছিল। তাই ইংরেজ শাসনের প্রথম

থেকেই এইসব মানুষেরা, যারা অন্নবস্ত্রের সন্ধানে গোটা দেশময় ঘুরে বেড়াত, তারা ডাকাতের দলে ভিড়ে যায় প্রাণধারণের তাগিদে।

অস্থিরতা ছড়ায় জেলার চৌকিদার মহলেও। রাত্রিতে পাহারা আর দিনে জমিদারের কাছারিতে হাড়ভাঙা খাটুনির পরিবর্তে নিকৃষ্ট শ্রেণীর অপরিমিত জমি কঠোর পরিশ্রমে চষে তাদের দিনযাপনের করুণ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গ্রামজীবনের সর্বব্যাপী অস্থিরতা-অনিশ্চয়তা তাদেরও অস্থির এবং উদ্বেল করে তোলে। দাগ কাটে সমাজের গভীরে। তারপর বাংলা ও বিহারের কৃষকেরা যখন ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, তখন এদের একটা বড় অংশ তাদের সেই বিদ্রোহে সামরিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এল। আর বাংলা ও বিহারের ক্ষুব্ধ কৃষক-কারিগরদের সর্বত্র-ছড়িয়ে-পড়া অসংখ্য ছোট ছোট এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা দলের সঙ্গে, দীর্ঘকালের সামরিক অভিজ্ঞতা নিয়ে বেকার সৈন্যদল যোগ দেবার ফলে, বিদ্রোহীরা হয়ে উঠল রণ-নিপুণ ও শক্তিশালী। অবশ্য এর অর্থ এমন নয় যে, বাংলা-বিহারের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে একটি ঐক্যবদ্ধ বাহিনীর পরিচালনায় তথা একক নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল। বিদ্রোহ চলেছিল অসংখ্য ছোট ছোট দল এবং দলনেতার পরিচালনায়। এক একটি অংশের জন্য ছিল এক এক জন পরিচালক বা বিদ্রোহী নায়ক।

পূর্ববর্তী অধ্যায়েই দেখা গেছে, মন্বন্তরের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের খাজনা আদায় নীতি, নাজাই কর, পাঁচসালা বন্দোবস্ত ইত্যাদির ক্রমপরিণতিতে গ্রামবাংলার মানুষের এক বিরাট অংশ কেমন করে প্রকৃত অর্থে সবহারা হয়েছিল। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, এদের মধ্যে যেমন ছিল খাজনার ভারে ক্লিষ্ট কৃষক, সুতী-রেশম-বস্ত্রের কর্মচ্যুত কারিগর, তেমনি ছিল বিধ্বস্ত মোগল সাম্রাজ্যের কর্মচ্যুত ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল। সামরিক জ্ঞান সম্পন্ন এইসব সৈন্যরা সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দলে যোগ দেওয়ায় বিদ্রোহীদের চরিত্রটাই গেল বদলে। বাংলার মানুষের সামগ্রিক হতাশা এদের উৎসাহিত করল

লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তিতে। রাজনৈতিক অরাজকতা ও অনৈক্যও এদের উৎসাহবৃদ্ধিতে কম ইন্ধন জোগায়নি। কোম্পানির নথিপত্রেই প্রকাশ পেয়েছে যে, মন্বন্তরের পরবর্তী অর্থনৈতিক দুরবস্থাই এইসব বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির কারণ ছিল। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে লেখা কাউন্সিলের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় : লুণ্ঠনকারী সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল তীর্থদর্শনের জন্যে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত দেশে এবং যেখানেই তারা যায়, লুণ্ঠনে লিপ্ত হয় ভরণ-পোষণের জন্য। মন্বন্তরের পরে তাদের দল ভারী হয়ে উঠেছে ক্ষুধার্ত কৃষকদের যোগদানে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে এই সন্ন্যাসী-ফকিরের দলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাশ হাজারের মতো।[৩৫] কোম্পানির অপর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় যে, এইসব সন্ন্যাসীর দলে প্রকৃত সন্ন্যাসী অল্পই ছিল। অধিকাংশই হল সাধারণ ক্ষুধার্ত মানুষ—যারা খাদ্য, বস্ত্র ও কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়ে, এমনকি পরিবারবর্গকে পর্যন্ত মন্বন্তরের গ্রাসে চিরতরে হারিয়ে, মুসলমান শাসক ও কোম্পানির কালেক্টরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল।

রেজা খাঁর আমলে, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের লুণ্ঠনের ফলে রাজস্ব মকুব করার আর্জিগুলি প্রথমদিকে অজুহাত মনে হলেও, যখন সত্যিই এর ফলে রাজস্ব আদায়ে অসুবিধে সৃষ্টি হল, তখন কোম্পানি সচেতন হল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সম্পর্কে। যদিও এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বর্ধিষ্ণু রায়ত ও জমিদারেরা, কিন্তু সরকারের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের সংঘর্ষের সময় তারা নিরপেক্ষই থাকত।

সাধারণ দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষেরা এই বিদ্রোহের শামিল হবার পরেই, তাদের সহযোগিতায় আশ্বস্ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান পরিচালক মজনু শাহ্‌র পরবর্তী লক্ষ্য হল স্থানীয় ধনী সম্প্রদায় ও জমিদারদের সমর্থনলাভ। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ফকির নেতা মজনু শাহ্‌ সম্ভবত এই কারণেই বাংলার বৃহত্তম জমিদার নাটোরের রানী ভবানীর কাছে এক পত্রে বিনীত আবেদন করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আশ্রয়

ও সাহায্য প্রার্থনা করে।[৩৬] কিন্তু এর পরবর্তী কালে নাটোরের বিভিন্ন স্থানে সন্ন্যাসীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ব্যাপক লুণ্ঠনের তৎপরতা দেখে মনে হয়, রানী ভবানীর কাছ থেকে কোনরকম সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায়নি। কিন্তু রানী ভবানী সাহায্য না করলেও অন্য অনেক জমিদারই তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় শক্তিশালী ইংরেজ শাসকদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার এটাও একটা মস্ত বড় কারণ। তারা সন্দেহ করেছিল যে বিদ্রোহীদের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্যের কারণ হয়তো সরকারের অনুগৃহীত জমিদারদেরই বিদ্রোহীদের প্রতি গোপন আনুগত্য ও সহায়তা। এতে একদিকে যেমন ইংরেজ সরকারের রাজস্ব আদায় ব্যাহত হচ্ছিল, অপরদিকে আদায়ীকৃত রাজস্ব আবার বিদ্রোহীদের দ্বারাই লুণ্ঠিত হচ্ছিল।

এই সময়ে বিদ্রোহীরা স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় আরম্ভ করে। আপসের জন্যই হোক, আর বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই হোক, বিদ্রোহীদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে এইসব জমিদারেরা কিন্তু বিদ্রোহীদের শক্তির প্রতি আনুগত্যই দেখিয়েছে। আর জমিদাররা যখন নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে অক্ষমতার কারণ হিসেবে সন্ন্যাসীদের আক্রমণের অজুহাত দেখিয়ে আবেদন-নিবেদন করেছে, ইংরেজ সরকার তাতে কর্ণপাতও করেনি। মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল খাজনা মকুবের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে রাজি হয় না। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, কোনরকম ক্ষতির দায়িত্ব সরকার নিতে পারে না। জমিদাররাই এইধরনের ঝুঁকি নিতে বাধ্য। ফলে বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনে রায়ত-জমিদাররা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, কোম্পানি তাদের কড়ায়গণ্ডায় রাজস্ব মিটিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের একের পর এক পরাজয়ে সরকার-পক্ষের বক্তব্য ছিল, "...the ryots gave no assistance but joined the Sannyasis with lathies and showed the

Sannyasis those whom they saw and concealed themselves in long grass and jungle and if any of the sepoys attempted to go into their villages they made a noise to bring the Sannyasis and they plundered the sepoy's firelocks".[৩৭]

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরে সন্ন্যাসী-ফকিরদের লুণ্ঠনজনিত কারণে ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের দু'টি আলোচনা-সভায় স্থির হয়, সামরিক শক্তি দিয়ে ঐ দু'টি স্থানে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা এমনভাবে করা হবে, যাতে টাকা আদায়ের কাজ কোনভাবেই ব্যাহত না হয়। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে পাটনা থেকে রামবোল্ড এক চিঠিতে জানান, "একটি বিরাট সন্ন্যাসীর দল, সংখ্যায় পাঁচহাজার, বিহারের সারেঙ্গিতে (সারন) প্রবেশ করেছে। সন্ন্যাসীরা বিহারের সর্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করছে। এর ফলে তাদের রাজস্ব আদায়ের কাজও ব্যাহত হয়েছে। সন্ন্যাসীদের আক্রমণে ইংরেজদের প্রায় আশি জনের মতো হতাহত হয়েছে।" এইভাবে পর পর ইংরেজ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্যাপ্টেন উইডিং-এর নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, "...to rid the country of them, as their stay strikes terror into the country people and greatly hurts the collections in that part...."[৩৮] এর ফলে সন্ন্যাসীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

সন্ন্যাসীদের দমন করার নানান পন্থা গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এদের বাংলায় প্রবেশের পথগুলি বন্ধ করতেও কোম্পানি সচেষ্ট হয়ে উঠল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে সাধারণত এরা বাংলায় প্রবেশ করত বলে, ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে পূর্ণিয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেখানকার সুপারভাইজার ফেরিঘাটগুলিতে গুপ্তচর বসালেন। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে খবর এল, প্রায় ৩০০ ফকির অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে

পূর্ণিয়ার চুণ্ডা ঘাটের কাছে কুশী নদী পার হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ একটি সামরিক দলকে সেখানে পাঠানো হল ফকিরদের উদ্দেশ্যে।

আচমকা আক্রমণে সমস্ত দলটাই বন্দী হওয়ায়, তারা বাধ্য হল অস্ত্রত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে।

ইতিমধ্যে মন্বন্তরের থাবা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে বাংলা-বিহারে। ইংরেজ কোম্পানিকে বিব্রত করার এই সুযোগটি বিদ্রোহীর দল ছাড়ল না। দুর্ভিক্ষ-কবলিত বুভুক্ষু মানুষেরা দলে দলে এদের সঙ্গে যোগ দিতে থাকল। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। সংগ্রহ করতে লাগল তাদের দান। ফকির-নেতা মজনু শাহ্ দিনাজপুরে বারবার আক্রমণ চালিয়ে কিছু মানুষের মনে ও কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। সম্ভবত ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে মজনু পূর্ণিয়ার ভিতর দিয়ে সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবেশ করেন। অতঃপর কোম্পানির সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে দলবল নিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি মজনু শাহ্ সহজে ভুলতে পারলেন না। এরপরে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে আবার তাঁর আবির্ভাব ঘটে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে মজনু ও তাঁর দল সমস্ত পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এমন তৎপরতা চালিয়ে গেলেন যে, তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা কোম্পানির সিপাইদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। মজনুর কার্যকলাপ ভাবিয়ে তুলল কোম্পানির কালেক্টর ও জমিদারদের। বিভিন্ন জায়গা থেকে লুণ্ঠন ও অত্যাচারের খবর আসতে লাগল। সেইসঙ্গে আসতে থাকল খাজনা মকুব করবার একের পর এক আবেদন। ভীত-সন্ত্রস্ত শাসনকর্তারা মজনু শাহ্‌কে বারবার সৈন্যদল ভেঙে দেবার বা যুদ্ধ না করে জেলা পরিত্যাগ করবার অনুরোধ করে পত্র লিখতে থাকে।[৩৯]

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি ওয়ারেন হেস্টিংস, 'কোনরকম অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে কেউ চলাফেরা করতে পারবে না', এই মর্মে একটি ঘোষণা জারি করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন এই আদেশের বলে খোদ

কোম্পানিরই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তখন এই আইনকে সংশোধিত করা হল : "এই আদেশ শুধুমাত্র সন্ন্যাসী-ফকিরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।" খোদ কলকাতাই সন্ন্যাসীদের আক্রমণের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই কলকাতার নিরাপত্তার কথা ভেবে এক আইন জারি করে সেখানকার সমস্ত বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের বিতাড়িত করা হল।[৪০]

সন্ন্যাসীদের তৎপরতার প্রধান স্থান ছিল উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ। কিন্তু ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গও মুক্তি পেল না। ঐ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই থেকে সেখানকার রেসিডেণ্ট খবর পাঠালেন : "পাঁচশো ঘোড়াসহ প্রায় ৬।৭ হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল ক্ষীরপাইয়ের পনেরো ক্রোশের মধ্যে অবস্থান করছে।" এইসব সন্ন্যাসীরা সম্ভবত গঙ্গাসাগরের তীর্থ শেষ করে পুরীর দিকে যাচ্ছিল। ঐ বছরই মার্চ মাসে দেড় হাজার বিদ্রোহী সৈন্যের একটি দল যশোরের পথে কলকাতা লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে থাকে। অপর একটি দল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে প্রবেশ করে। এই কলকাতাগামী দলটি ইংরেজ বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। আবার ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি বিদ্রোহী দল মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এদের সঙ্গে কয়েকটি দেশীয় কামারশালায় তৈরি কামানও ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪১] সেই মুহূর্তে শ্রীহট্ট, নদীয়া এবং বিহারের সারণ ইত্যাদি স্থান থেকে সন্ন্যাসীদের তৎপরতার খবর আসছিল। কোম্পানির সিপাইরা কোনভাবেই পেরে উঠছিল না তাদের সঙ্গে। পর পর দু'জন ক্যাপ্টেনের মৃত্যু হয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে। চার ব্যাটেলিয়ন সিপাই নিযুক্ত করেও সন্ন্যাসীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আর সেইসঙ্গে রাজস্ব-সংগ্রহও হয়ে উঠছিল এক দুরূহ সমস্যা।

সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল সমস্ত দেশময় ঘুরে বেড়াত, তীর্থে তীর্থে মেলায় মেলায়। এইসব উৎসব ও মেলার স্থান এবং দিনক্ষণ ছিল

এদের নখদর্পণে। হিন্দু সন্ন্যাসীদের সব থেকে বড় সমাবেশ ঘটত কুম্ভ-মেলায়, যা প্রতি তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হ'ত হরিদ্বার, এলাহাবাদ ও উজ্জয়িনীতে। কুম্ভমেলার সঙ্গে বাংলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলার পর, ঐ বছরের শেষের দিকে এবং ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের গোটা বছরের এক দীর্ঘসময় জুড়ে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চলেছিল সন্ন্যাসীদের একটানা আক্রমণ ও লুণ্ঠন। এর ফলে বাংলার নিরাপত্তার কথা ভেবে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ঠিক এর পরের কুম্ভমেলায়, মেলার শেষে সন্ন্যাসীর দলকে বাংলা সীমান্তে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। যদিও পরবর্তী সাগরমেলায় যোগ দেওয়াই ছিল হয়তো সন্ন্যাসীদের আপাত উদ্দেশ্য। পশ্চিমদিক থেকে আগত এই সন্ন্যাসীরা তীর্থ, মেলা, পীর-ফকিরদের সমাধি, বিভিন্ন মন্দির ইত্যাদি দর্শন উপলক্ষে ভ্রমণপথের দু'পাশের গ্রামে গ্রামে দাবি করত খাদ্য ও আশ্রয়। আর এদের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা তথা দান-সংগ্রহের পরিকল্পনা, গতিবিধি ইত্যাদি নির্ধারিত হ'ত স্থানীয় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। কোম্পানির নথিপত্রেই স্বীকার করা হয়েছে যে, মন্বন্তরের পরবর্তী এইসব বিশৃঙ্খলার কারণ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ক্রমবিস্তার। তখন তাদের দল ভারি হয়ে উঠেছে ক্ষুধাতাড়িত হাজার হাজার মানুষের, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের যোগদানে। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে লিখিত কাউন্সিলের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, লুণ্ঠনকারী সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল তীর্থদর্শনের জন্যে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে। আর যেখানেই তারা যায়, লুণ্ঠনে লিপ্ত হয় নিজেদের ভরণপোষণের জন্য। তারা তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে আত্মরক্ষার তাগিদে।

বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কার্য-কলাপ বন্ধ করা গেল না। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর, গভর্নর-জেনারেল ইংলণ্ডে কোম্পানির ডিরেক্টরদের জানালেন যে, সন্ন্যাসীদের তৎপরতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ফলে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার

করতে হচ্ছে প্রচণ্ডরকমের। এই সময় গভর্নর-জেনারেল চুনারে এক শক্তিশালী বাহিনীকে স্থাপন করে, তাদের বাংলায় প্রবেশের সহজ পথ বন্ধ করে দিলেন। তা সত্ত্বেও ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে স্বয়ং মজনু শাহ্ তাঁর দলবল নিয়ে গোপন পথে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেন। এই জেলায় ঘুরে ঘুরে এবার তিনি ইংরেজ কুঠি ও জমিদারদের ওপর আক্রমণ করে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করতে থাকেন। এই সময় রক্ষী-বাহিনী থেকে বহু বরকন্দাজ মজনুর সঙ্গে যোগদান করে। মজনুকে ধরবার জন্মে ইংরেজ বাহিনী আসবার আগেই মজনু জেলা ছেড়ে পালিয়ে যান।

কোম্পানির চিঠিপত্রে একটা কথা বার বার লিখিত হতে দেখা যায় যে. সন্ন্যাসীরা নাকি গ্রামবাসীদের ধনসম্পদ যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করত। কিন্তু এই সংঘর্ষে যে গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় ও সক্রিয়ভাবে সন্ন্যাসীদের সাহায্য করত, সে বিষয়ে কোনরকম সন্দেহের অবকাশই নেই। কোন কোন চিঠিতে দেখা যায়, যাতে বিদ্রোহীরা জনসাধারণের সম্পত্তি হরণ ও তাদের ওপর কোনরকম অত্যাচার না করে তার জন্য বিদ্রোহের নায়করা তাঁদের অনুচরদের কঠোর নির্দেশ দিতেন। আর সাধারণ মানুষকে নিয়ে, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য যে বিদ্রোহ, তার দ্বারা সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি সম্ভবপর হতে পারে না। বরং কিছু কিছু চিঠিপত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় : "গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিদ্রোহীদের খাবারের ব্যবস্থা করেছে। বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের ওপর কোনরকম অত্যাচার করেনি। শুধু তাই নয়, বহু কৃষক বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেছে। কৃষকেরা সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করে সেই কর বিদ্রোহীদের হাতে স্বেচ্ছায় অর্পণ করেছে।" সাধারণ মানুষের এই অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণেই বহু চেষ্টা করেও কোম্পানি তার বিশাল সামরিক বাহিনী নিয়েও মজনুকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছিল বার বার। ব্যর্থ হয়েছিল ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধু-রানীকে দমন করতে। শোনা যায়, মজনু জমিদার বা কোম্পানির

কাছ থেকে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ সাধারণ মানুষের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিলিয়ে দিতেন, হয়তো এই কারণেই তিনি অর্জন করেছিলেন সাধারণ মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতা। এই গ্রামবাসীরাই সংঘর্ষের সময় যেদিকে মজনু শাহ্ চলে যেতেন, তার বিপরীত দিকে সিপাইদের তাঁর পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়ে বিভ্রান্ত করত। আর সেই অবসরে মজনু ও তাঁর দল হয়তো কোন জমিদারের বাড়ি বা কোম্পানির কুঠি আক্রমণ করত। কোন তহশিলদারকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাবি করত মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ।

এমন কথা কখনও শোনা যায়নি যে, মজনু বা তাঁর দল সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘর লুঠপাট করেছে। আসলে মজনু শাহ্ ছিলেন এমন একজন ফকির নেতা, যিনি বাংলার শোষিত কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে। মন্বন্তরোত্তর বাংলার কৃষকদের ওপর, জমিদার ও বিদেশী শাসনের দ্বিমুখী শোষণের বিরুদ্ধে এ ছিল তাঁর সশস্ত্র সংগ্রাম।

তবে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলার লোকগাথায় মজনু ও তাঁর দলবল সম্পর্কে যে-সব ছড়া-কাহিনী পাওয়া যায় তাতে মজনু চরিত্রের একটি অন্ধকার দিকই প্রকট হয়ে উঠেছে। সেখানে মজনু বা তাঁর দলের সন্ন্যাসী-ফকিরের যে চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তা কোনমতেই দেশের কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ সন্ন্যাসী-সৈনিকের ছবি নয়। তা হল লুঠেরা, কামুক, দুর্বৃত্তের ছবি, তথা 'অধম সন্ন্যাসীর' ছবি। এর থেকে একটা জিনিস মনে হয়: আবহমানকাল ধরে সব আন্দোলনে যেমন হয়, এখানেও সম্ভবত তাই হয়েছিল। মজনুর দলেও বেশকিছু সুবিধাবাদী দুর্বৃত্ত ঢুকে পড়েছিল নিজেদের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

অষ্টাদশ শতকে রচিত কোন কোন পুঁথিতে দেখা যায় সন্ন্যাসীর বেশে কিছু লোক শিশু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, অথবা ক্রন্দনরত শিশু-পুত্রটিকে তার মা 'এক্ষুনি সন্ন্যাসী আসবে' বলে ভয় দেখিয়ে ঘুম

পাড়াচ্ছে। যেমন ধরা যাক, আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকে রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের একটি পুঁথিতে রয়েছে, :

"চুপ কর ঘুম যাও সন্ন্যাসী আয়সেছে"[৪২]।

কিংবা রামপ্রসাদ সেনের 'কালিকামঙ্গলে'র একটি পুঁথিতে পাওয়া যাচ্ছে, কোতোয়ালরা নানান ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে চোর ধরবার জন্যে, তার মধ্যে সন্ন্যাসীর বেশও একটি। পুঁথির পাতায় কখনও সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনায় ভুল তথ্য পরিবেশিত হয় না। সুতরাং মনে হয় এইসব সন্ন্যাসীদের কোন কোন দল গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ছোট ছেলে সংগ্রহ করত, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে নিজেদের দল বাড়াবার জন্য। আর তা যদি হয়, তবে হয়তো এরাও সেই পূর্বোক্ত 'অধম সন্ন্যাসী'রই দলভুক্ত ছিল।*

বিশাল সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনযন্ত্রের অধিকারী হয়েও, জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে দমন করতে ইংরেজ সরকারের সময় লেগেছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সফল বিদ্রোহ বলা চলে না। এদের অসাফল্যের প্রধান কারণগুলি হল : অভিজ্ঞতা, যোগাযোগ, একক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, সংঘবদ্ধতা, ধর্মীয় ঐক্য ও আদর্শের অভাব। এই অভাবের কারণেই শেষের দিকে এরা পারস্পরিক দলীয় দ্বন্দ্ব-কলহের শিকার হয়ে হীনবল হয়ে পড়ে। কিন্তু অ-সফল হলেও এই বিদ্রোহকে গুরুত্বহীন মনে করবার কোন কারণ নেই। বাংলার হঠাৎ পরিবর্তিত অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থাকে যে বাংলার কৃষক সম্প্রদায় ও গ্রামীণ সাধারণ মানুষ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারেনি, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ বাংলার

* সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে সমকালীন পুঁথির সাক্ষ্য অবশ্যই পর্যাপ্ত নয়। তবে আঠারো শতক এবং তার পরবর্তীকালের সমাজ-সচেতন কয়েকজন গ্রাম্যকবির ছড়া ও গাথায় শতাব্দীর এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায়। 'ছড়া ও গাথায় ইতিহাস' শিরোনামে পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে।

সমাজের বুকে তার একটি ব্যাপক ও গভীর দাগ রেখে গেছে। এই বিদ্রোহের পথ ধরে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলায় ছোটবড় অনেক বিদ্রোহই আত্মপ্রকাশ করেছে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ অবশ্যই তাদের পথপ্রদর্শকের গৌরব দাবি করতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত একটি পত্র।

২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি, সং. ১২৩৩।

৩. ঐ, সংখ্যা ৪৯১।

৪. বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি পুঁথি।

৫. Transactions in India, 1786 by Young Husband, pp. 123-24.

৬. "...three battalions of sepoys appointed for the collection of the revenues of the Subah, are employed in pressing payments..."
(Calendar of Persian Correspondence, Vol. 3, p. 154, Letter No. 577)

৭. ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতের রেশমশিল্প বিষয়ে যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল সে-সম্পর্কে লেখা পূর্বোক্ত কবিতাটি 'Gentleman's Magazine'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। দ্র. White Sahibs in India by Reginald Reynolds, 1946, p. 26.

৮. ডিরেক্টরবৃন্দ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটিকে জানালেন— "...This regulation [যে নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র বাংলার প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানো হয়েছিল], seems to have heen productive of very good effects, particularly in bringing over the winders, who were formerly so employed to work in the factories. Should this practice through inattention have been suffered to take place again, it will be proper to put

a stop to it, which may now be more effectually done, by an absolute prohibition under severe penalties by the authority of the Government." এর উত্তরে সিলেক্ট কমিটির মন্তব্য : "·· this letter contains a perfect plan of policy, both of compulsion and encouragement which must in a very considerable degree operate destructively to the manufactures of Bengal. Its effects must be to change the whole face of that industrial country, in order to render it a field for the produce of the crude materials subservient to the manufactures of Great Britain. (ibid, p. 26).

৯. বীরভূম জেলার সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১০. ঐ।

১১. "···The band-o-bast for the year 1170 (Fasli) should be settled at this time. But when the writers speaks to the zamindars and farmers about the term of the band-o-bast, they straightway reply, 'We have no power or footi-ngin the districts. How can we discuss the terms ?···The farmers also from their mistaken notions assert that if the zaminders are deprived of their customary privileges, nothing will be left to them (The farmers). They have accordingly declined to offer terms and even refuse to come to Murshidabad."

(Callender of Persian Correspondence, Vol. 3, p. 71, Letter No. 234).

১২. ···In October 1788, the Calcutta newspaper announced that a Beerbhoom treasure party had been attacked on the South of the Adji, the military guard over-

powered, five men slain and more than three thousand pounds worth of silver carried off. (Annals of Rural Bengal by W. W. Hunter, p. 17)

১৩. বীরভূম জেলার সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৪. Petition of the zaminders of paraganis Mymensigh, Jafarsah, Alapsign and Sherpur, dated 6. 3. 1783. Quoted in The Sannyasis in Mymensigh by J. M. Ghosh, p. 4.

১৫. Dabistan by Muhammed Mahasan Fani.

১৬. Bengal District Gazetteers—Mymensigh by F. A. Sachse p. 29.

১৭. "To Sayyid Badal Khan, Fauzder of Hooghly : Learns that on the 3rd instant, the Nawab Shuja-u-d-daul-ah, Raja Beni Bahadur, Mir-qasim, Sumroo, Himmat Ghir and the other commanders of the enemy marched with their whole force with cannon, rockets etc., from their camps two or three Ros beyond Patna and atta-cked Major Carnac's entrenchments at Pachapahar." (Calendar of Persian Correspondence, Vol. I, p. 311, Letter No. 2232)

১৮. The Himalayan Districts of the North Western Provin-ces of India by Edwin T. Atkinson, Vol. 2, p. 601-603.

১৯. Letter from the Committee of Circuit to the Council at Fort William, dated, Cossimbazaar, 15th August 1772. Quoted in Annals of Rural Bengal, W. W. Hunter, p. 45.

২০. Letter from the President and Council (Secret Department) to the Court of Directors, dated 15th

January 1773, quoted from the same, p. 44.

২১. ibid., dated 1st March 1773, quoted from the same.

২২. Freedom Movement and Indian Muslims by Santimay Roy, p. 1

২৩. রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৭, পঞ্চম ভাগ, বিশেষ সংখ্যা, সেরপুরের ইতিহাস, পৃ. ৭৯-৮০।

২৪. Letter from Lt. Brenan to the Collector of Rangpur, 28 June, 1787, quoted in A Report on the District of Rangpur by E. G. Glazier, p. 61.

২৫. A Report on the District of Rangpur by E. G. Glazier.

২৬. ibid., p. 41.

২৭. ibid., p. 67.

২৮. Letter from the Collector of Rangpur to Lt. Brenan, 12 July, 1787, ibid.

২৯. A Report on the District of Rangpur, by E. G. Glazier, p. 12.

৩০. ibid.

৩১. Letter from D. H. McDowell to Lt. Brenan, dated 12 July, 1787, quoted in Bengal District Record : Rangpur (1786-87), Vol. VI.

৩২. Secret Department Proceedings, dated 21 and 25 February, 1760. Quoted in Selections from unpublished Records of Government, Vol. I, by Rev. James Long, p. 206.

৩৩. Annals of Rural Bengal by W. W. Hunter, p. 70.

৩৪. ও'ম্যালির মতেও বিদ্রোহীরা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সৈন্যবাহিনীর সৈন্য ও সর্বস্বান্ত চাষীর দল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাদের জীবিকা হারিয়েছিল, তাদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ লক্ষ। আর জমি থেকে উচ্ছন্ন, সর্বস্বান্ত কৃষক ও কর্ম-

চ্যুত কারিগরগণ এদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল। History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule by L. S. S. O'Malley, p. 107.

৩৫. Letter from the President and Council (Secret Department) to the Court of Directors, dated 1st March, 1773, quoted in Annals of Rural Bengal by W. W. Hunter, p. 44.

৩৬. The Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal by Jamini Mohan Ghosh. p. 11.

৩৭. Two Letters from Mr. Purling, Supervisor of Rangpur to the Revenue Council, dated, 29th and 31st December, 1772, quoted from the same, pp. 50-51.

৩৮. The Extracts of Rumbold's letter, dated 20 April, 1767, quoted in Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, by Rev. James Long.

৩৯. ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, সুপ্রকাশ রায়, পৃ. ৪২-৪৩।

৪০. "Notice is hereby given to all Bairagis and Sannyasis who are travellers, strangers and passengers in this country, cxepting such of the caste of Ramanandi and Gauria who have for a long time been settled and receive a maintenance in land money or Gundi from the Government or the Zaminders of the province, likewise, such Sannyasis as are allowed charity ground for executing of religious offices etc., to leave the town of Calcutta, its precinties, or any other place of residence in it within seven days from the publication of this advertisement, and depart from the Subahs of Bengal and Bihar in two months.

"It is further declared that if any of the above mentioned sects shall be found in Bengal or Bihar at the expiration of two months they are to be seized and put on the roads for life made to work at the public buildings and have their property confiscated to the Government. If any one with a view of evading the intent of this publication shall claim donations of land and his claim be falsified he will be punished as above directed." Secret Consultation No. 6, dated 21st January 1773. Quoted in 'Dawn of New India' by Brajendra Nath Banerjee, p. 33.

৪১. Letter from the Collector of Murshidabad to the Governor-General, dated 30th Nov., 1773.

৪২. বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত কৃষ্ণমঙ্গলের পুঁথি 'যশোচন্দ্রের গোবিন্দ-বিলাস'।

সমাজজীবনের নানা আন্দোলন, স্থানীয় কোন বিশেষ আলোড়নসৃষ্টি-কারী ঘটনা, রাজা-জমিদারদের অত্যাচার এবং গণ-আন্দোলন থেকে শুরু করে, সাময়িক কোন অতি তুচ্ছ অথচ কৌতুককর ঘটনা ইত্যাদি নানা বিষয়ই আবহমানকালের বাঙালি কবির ছড়া ও গাথায় স্থানলাভ করেছে। এই শ্রেণীর কবিদের অধিকাংশই অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রাম্য কবির পর্যায়ভুক্ত। তাদের রচিত এইসব ছড়া বা গাথার সাহিত্যিক মূল্য তেমন কিছু না থাকলেও, এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কারণ, এতে যুগোচিত প্রাণস্পন্দন না থাকলেও এমন অনেক উপকরণ পাওয়া যাবে, যাতে সমকালীন সংকটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে অনায়াসেই।

বর্তমান অধ্যায়ে এই শ্রেণীর কিছু রচনা নিয়ে আলোচনা করা হবে, যার মধ্যে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সমাজজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের দুর্যোগের কিছু কিছু ছবি ফুটে উঠেছে। আলোচ্য গাথা-কাব্যগুলির সবই যে আঠারো শতকের রচনা এমন নয়। পরবর্তীকালের কবিরাও এইসব বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলম ধরেছিলেন। সেইসব ঘটনা অবশ্যই ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। অনেক-সময় এমনও দেখা গেছে যে, যে-কোন কারণেই হোক না কেন, ঐতিহাসিক সততা তথা সত্যতা সেখানে রক্ষিত হয়নি। তা সত্ত্বেও এতে ঘটনার যে সমাবেশ ও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে তার মধ্যে থেকে ইতিহাসের টুকরো সন্ধান করে, মূল সুরটি খুঁজে পাওয়া তথা ইতিহাসের ব্যক্তি বা দৃশ্যপটটুকু চিনে নেওয়া অসম্ভব নয়। গ্রামের কবি অতি সহজ সরল আন্তরিকতায়, সমসাময়িক ঘটনাকে যে-চোখে যেমনভাবে দেখেছেন, বা যে-ছবি তাঁর কাছে ধরা পড়েছে—তাই তিনি অনাড়ম্বর-ভাবে পদ্যবন্ধ করেছেন। প্রথমত, গদ্যের প্রচলন তখনও তেমনভাবে

হয়নি ; দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর সহজাত বিচারবুদ্ধি দিয়েই জানতেন যে, গ্রামের মানুষের কাছে কবিতা, কাহিনীকাব্য, পাঁচালি বা ছড়ার আবেদন, অন্যান্য যে-কোন মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি।

এই গাথা-কাব্যের মধ্যে আঠারো শতকের মধ্যপর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের চিত্র বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। কারণ, ঐতিহাসিক সেই অর্ধশতাব্দীটি যেমন রাজনৈতিক আলোড়নের ঘন বাতাবরণে আন্দোলিত, এমন বোধহয় আর কোন সময়েই নয়। এখানে সামান্য কয়েকটিমাত্র উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে, যার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের বাংলাদেশের সমাজবিবর্তনের ধারাটি বুঝতে সুবিধে হয়। এই গাথা-কাব্যের মধ্যে এমন কিছু উপকরণ পাওয়া যায়, যাতে সমকালীন সংকটের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হতে পারে অনায়াসেই।

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ নয় বছর ধরে বাংলার জনজীবনের ওপর দিয়ে মারাঠা আক্রমণের ঝড় বয়ে গেছে, যা বাংলার জনজীবনকে একেবারে সর্ববিষয়ে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' নামক ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে আমরা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারি। এই গ্রন্থখানির কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এই একই বিষয় নিয়ে এক অজ্ঞাত, অখ্যাত গ্রাম্যকবির রচনা 'মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা'র খবর হয়তো অনেকেই জানেন না। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"বীরভুম থাক্যা আইল বরগি বর্দ্ধমানে থানা।
বর্দ্ধমান ছাড়িয়া হুগলি আইল কথজনা॥
ফজত্তুর সেছমান পলায় আর ফরাশ।
এনসাল ওলোন্দাজ পলায় পাইয়া তরাস॥
কলিকাতায় ঙিঙ্গিরাজ পলায় আর পলায় শ্বাস।
বরগিরে দেখিয়া তারা না করে বিশ্বাস॥
হুগলির ফৌজে আস্যা…কানানি।

মির হবিব সনে বর্গি করিছে মেলানি ॥
কেহ বলে নৈতন ফজদূর আসিছে মোর দেশে।
মিলন করিতে কেহ যায় তার পাশে ॥
কানানি দিয়া হুগলির ফৌজে আস্থে বর্গির পাল।
বর্গি দেখ্যা লোকজন কাঁপে হালে হাল ॥
বর্গি সকল যখন আস্যা হবে এগস্তর।
কাঙ্গাল গরিব মার‍্যা ঘুচাবে লুটিবে শহর ॥
কাটয়াতে পার হআ আইল হুগলি শহর।
বর্গি দেখিতে চলিল যত নগরের নাগর ॥…"[১]

বীরভূম থেকে এসে বর্গীরা প্রথমে বর্ধমানে স্থায়ী হল। তারপর বর্ধমান ছেড়ে কিছুসংখ্যক বর্গী হুগলি জেলায় ঢুকে পড়ল। বর্গীদের আসার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে ইংরেজ ওলন্দাজ ফরাসি সকলেই প্রাণ নিয়ে পালায়। বর্গীদের কেউ বিশ্বাস করে না। কেবল মিরহবিব বর্গীর দলের সঙ্গে হাত মেলায় (আলিবর্দিকে শায়েস্তা করতে ?)। নগরবাসীর মধ্যে এক অংশ মনে করছে দেশে নতুন রাজার ফৌজ এসেছে। তারাও সেই হবু রাজার সঙ্গে মিলতে ইচ্ছুক হয়। অপরাপর সকলেই বর্গী দেখে ভয় পায়। কারণ তারা জানে এই বর্গীরা এসে দেশের সব গরীবদের মেরে শহর লুঠ করে নেবে। তবু নগরের কিছু কিছু লোক বর্গী দেখতে যায় সাগ্রহে।

এখানে দেখা যাচ্ছে, কবিতাটির রচয়িতা অজ্ঞাত-অখ্যাত হলেও দেশের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি কিন্তু মোটেই অজ্ঞ ছিলেন না। সামান্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে তিনি প্রথমেই আমাদের জানাচ্ছেন, বর্গীদের আগমনপথ। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে বর্গীরা বাংলায় যতবার যাতায়াত করেছে, প্রত্যেকবারই তারা উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে বীরভূম, বর্ধমান হয়ে মুর্শিদাবাদ বা কাটোয়ায় ঢুকেছে। আর সেই আগমনে ইংরেজ ওলন্দাজ ফরাসি সবাই পালিয়ে বেঁচেছে। কেউ কেউ কলকাতার পথে আর কেউবা গেছে পদ্মার পারে। সে-খবরও

এখানে মেলে। শুধু তাই নয়, দেশে বর্গীরা এলে কেমন করে এবং কেনই বা মির হবিব বর্গীর দলে ভিড়লেন, কি কারণেই বা একদল জমিদার শ্রেণীর লোক এই বর্গীদের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়েছিল, এসব ইতিহাস কবির মোটেই অজানা ছিল না। বর্গীদের শহর-বাজারে এসে লুঠপাটের খবরও এখানে রয়েছে। তবে নগরের সকলের বর্গী দেখতে যাওয়ার বর্ণনাটা কিঞ্চিৎ নতুন খবর।

বাংলা ১১৭২ সাল বা ইংরেজি ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখটি কোম্পানির দেওয়ানিলাভের ঐতিহাসিক তারিখ। ইংরেজদের এদেশে রাজনৈতিক জয়যাত্রা সেই থেকেই শুরু হল, যাকে কেন্দ্র করে বাংলার মাটিতে তৈরি হয়েছিল অনেক করুণ ইতিহাস। পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রামের এক অখ্যাত কবি রামপ্রসাদ মৈত্রেয় সেই ঐতিহাসিক তারিখটিকে অমর করে রেখে গেছেন পদ্যবন্ধে আবদ্ধ করে :

"অপূর্ব্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেব রূপী।
ছাড়িলা আহ্নিক পূজা পরিধান কুর্ত্তি মুজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী॥
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগরবেশে
কৈলকাতা পুরাণা কুঠি আদি।
গতামল সুভেদারী শুভ সন বাহাত্তরী
আংরেজ আমল তদবধি।"[২]

এখানে গ্রাম্যকবি ইংরেজ বণিকদের দেবতার আসনে বসিয়েছেন অক্লেশে। তাঁর মতে স্বর্গের দেবতারাই রূপবদল করে, পূজা-আহ্নিক পরিত্যাগ করে, সাহেবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন বাংলায়। গ্রাম্যকবিদের এইধরনের মনোভাব আমরা ইতিপূর্বে মুসলমান আমলেও দেখেছি। আওরঙ্গজেবের সমকালীন জনৈক বাঙালি হিন্দুকবির উক্তিতে পাই স্বর্গের দেবতারা তাঁদের রূপ-গুণ-আচরণের পরিবর্তন করে যবনরূপে

"দিল্লীয়ে কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালী।"[৩] অর্থাৎ স্বর্গের দেবতারাই যবন-রূপে দেশশাসন করতে আবির্ভূত হলেন। এই প্রসঙ্গে রামাঞী পণ্ডিতের 'শ্রীধর্মপুরাণে'র পুঁথিটির কথাও মনে করা যেতে পারে। সেখানে দেখি ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট করতে প্রভু নিরঞ্জনের যবন বেশে আবির্ভাব :

"ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।
জাজপুরে প্রবেসিলা হইয়া জবন ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জত পথে নাগালি পায়।
ভালের তিলক সব পুচ্ছ্যা পেলে পায় ॥
জাতি নাশ করে কার মুখে দিয়া ছিবা।
মার্য্যা কাড়্যা খায় কার দিয়া ঘাড় দাবা ॥
পাসান প্রতিমা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়।
হাতে প্রাণ কর্য্যা কত দেয়াসি পলায় ॥
বামনে ডাকিয়া প্রভু কহেন কৌতুক।
তিন ভাগ জাজপুর করিব তুড়ুক ॥
বেদ বিদ্যা ঘুচাইয়া পড়াব কোরাণ।
নিশ্চয় করিল তোরে ইথে নহে আন ॥
... ...
আনিয়া করার পানি ধোয়াইল হাথ।
বামনে যবন করে দুনিয়ার নাথ ॥"

দেওয়ানিলাভ করে ইংরেজরা এদেশে চালু করল দ্বৈতশাসন। অর্থাৎ দেশের ভালো-মন্দর দায়দায়িত্ব রইল নবাবের হাতে, আর রাজস্ব-আদায়ের ও বিলি-ব্যবস্থার ভার নিল ইংরেজ সরকার। বাংলায় এই রাজস্ব-আদায়ের ভার অর্পণ করা হল রেজা খাঁর ওপর, আর বিহারের ভার দেওয়া হল রাজা সিতাব রায়কে। বাংলার নায়েব-নাজিম রেজা খাঁর অত্যাচার ও শোষণ যে মন্বন্তরকে ত্বরান্বিত করেছিল, এ কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই রেজা খাঁর

অত্যাচার ও মন্বন্তর-জনিত শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ রয়েছে একটি ছড়ায়:

"নদনদী খালবিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল॥
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হ'ল রেজা খাঁর তরে॥
একচেটে ব্যবসা, দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর॥
পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মরে লোক, অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে॥"[৪]

মন্বন্তরের আগের গোটা একটা বছর জুড়ে প্রবল খরা এবং তার জন্য নদনদী খালবিল সব শুকিয়ে শুকনো মাঠে পরিণত হওয়া, অন্নাভাবে দেশের হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, ওদিকে বাংলার সেই মহা দুর্যোগের দিনেও ইংরেজ বণিকদেব, সমস্ত চাল জোর করে কিনে নিয়ে, একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমে আকাশচুম্বী দরে বিক্রি, বাংলায় যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অধিকাংশ মানুষের পেটের দায়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে বিক্রি করা, বা অভক্ষ্য ভক্ষণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার যে করুণ ইতিহাস, তা চুম্বকাকারে বর্ণনা করেছেন গ্রাম্যকবি আন্তরিক মুন্সিয়ানায়। আর এই অবস্থার জন্য তিনি রেজা খাঁকেই দায়ী করেছেন ঐতিহাসিকের অটল সিদ্ধান্তে।

উত্তরবঙ্গের ইজারাদার রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন কুখ্যাত দেবী সিংহ। দিনাজপুরের নাবালক মহারাজার দেওয়ানও ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে দু'দুটো ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তাঁর অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কৃষকদের ওপর নিত্য-নতুন অত্যাচারের ফলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে অনেকটা বাধ্য হয়েই। এই বিদ্রোহী কৃষকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন মজনু শাহ্, মুসা শাহ্, ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধুরানী। এই নির্মম অত্যাচার, যা অসংখ্য প্রজাকে করে

গৃহহারা, যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পথকে করেছিল ত্বরান্বিত, সেই অত্যাচারের নায়ক দেবী সিংহের চরিত্র ও তার নির্যাতন-পদ্ধতির বিস্তারিত ছবি প্রকাশ পেয়েছে রংপুর অঞ্চলের রতিরাম দাস নামক জনৈক ব্যক্তির রচিত 'জাগের গান'-এ।[৫] কবি তাঁর এই 'জাগের গান'-এর 'রাস' অংশের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাসকলের সম্মিলিত বিদ্রোহের বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য গাথাটির রচয়িতা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লেখেন—"এই কবিতা-রচক রতিরাম রঙ্গপুর জেলায় প্রাচীন ইটাকুমারী গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন।"[৬]

সুতরাং আলোচ্য গাথা-কাব্যটি আঠারো শতকের শেষের দিকের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। এই দীর্ঘ গাথা-কাব্যটির অংশবিশেষ মাত্র এখানে উল্লেখ করা হল :

"কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বার ঢিং॥
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন॥
রাজার পাপেতে হৈল মুলুকেতে আকাল।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল॥"

কোম্পানির আমলে রাজা দেবী সিংহের ক্ষমতা হয়েছিল অপ্রতিহত। পাপী দেবী সিংহের সহকারীরাও ছিল তারই যোগ্য সহচর। এই সময়ে দেশের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, মানুষ টাকা হাতে থাকা সত্ত্বেও খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে অনাহারে মারা যেত। এই অত্যাচারী অসৎ দেবী সিংহ খাজনা আদায়ের সময়ে আবার রায়তদের কাছে 'কালান্তক যমের' আকার ধারণ করত।

"কত যে খাজানা পাইবে তার লেখা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই॥
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।

মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল।

মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার॥
সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা।
দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা॥"

খাজনা আদায়ের লোভ মাত্রাছাড়া আকার ধারণ করেছিল। ছোট-বড় ধনী-মানীর কোন বাছবিচার না করে সকলকেই মারধোর করে গ্রামে কান্নার রোল তুলে খাজনা আদায় করাই যেন দেবী সিংহের রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়। অত্যাচারী দেবী সিংহের যোগ্য দলবলের কামুকতায় প্রজাদের অন্তঃপুরের অবস্থাও কাহিল হয়েছিল।

"পারে না ঘাটায় চলিতে ঝিউরী বউরী।
দেবীসিংহের লোকে নেয় তাকে জোর করি॥
পূর্ণ কলি-অবতার দেবীসিংহ রাজা।
দেবীসিংএর উপদ্রবে প্রেজা ভাজা ভাজা॥"

দেবী সিংহের অত্যাচার, আর অধিক রাজস্ব আদায়ের জুলুমের শিকার হয়ে দেশের রায়তদের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তারও বর্ণনা পাওয়া যায় আলোচ্য কবির রচনায়।

"রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাত যুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয় খান করি উপবাস॥

... ...

রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ায় নাই জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল॥

বছরে বছরে এলা হইতেছে আকাল।
চালে নাই খেড় কারো ঘরে নাই চাল॥
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারো মায়া॥"

অর্থাৎ রাজার পাপে বছর বছর আকাল সহ প্রজাদের হাজার দুর্গতি। এখানেও দেখা যাচ্ছে মন্বন্তরের জন্য দেবী সিংহকে দায়ী করা হচ্ছে। এইভাবে দেবী সিংহের শোষণ-পীড়নের করুণ কাহিনী অখ্যাত এক গ্রাম্যকবির চিত্রায়ণে ধরা পড়েছে। আবার সাধারণের মতো স্বল্পে সন্তুষ্ট এই কবিই আনন্দিত হন, যখন শোনেন ইংরেজ শাসক দেবী সিংহের বিচারে বসেছেন, তা সে-বিচারের প্রহসনের শাস্তি যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন। লক্ষণীয় যে, এই কবির মতেও ইংরেজরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

"ইংরাজের হাতে রাজ্য দিলেন চক্রপাণি।
সুবিচার করি গেল আপনি কোম্পানি॥
ইংরাজ বিচার করে এজলাস করি।
একে একে ফাটকেতে রাখে টিংএ করি॥"[৭]

১২২০ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক পঞ্চানন দাস রচিত 'মজনুর কবিতা' নামে একটি ঐতিহাসিক গাথার সন্ধান পাওয়া যায়।[৮]* আলোচ্য গাথা-কবিতাটির পটভূমি ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহে বাংলার সাধারণ কৃষক-প্রজামাত্রেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ-ভাবে ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেই ঘটনারই প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য গাথাটিতে। যদিও এ কথা অনস্বীকার্য যে, আলোচ্য গাথায় মজনু শাহ্‌র যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিদ্রোহী নায়ক মজনু শাহ্‌র কতটুকু সাদৃশ্য আছে, সে-সম্পর্কে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। এখানে

* ছড়াটির অংশবিশেষ পূর্বে একবার উদ্ধৃত হয়েছে

একদিকে যেমন মজনু চরিত্রের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, রাজকীয় আচরণ ও শক্তিমান যোদ্ধা-পরিচয় ফুটে উঠেছে, অপরদিকে তাঁর লুণ্ঠনপটু অত্যাচারী এক দস্যুসর্দারের রূপটিও ঢাকা পড়েনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মজনু এর বাইরে আরও অতিরিক্ত কিছু ছিলেন, যা হয়তো গ্রাম্য-কবির স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি।

"শুন সভে একভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বারনা॥
কালান্তক যম বেটাক্‌ কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥"

মজনুর সাজপোশাক দলবল সম্পর্কে কবির সরস কৌতুক :

"সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডাবান ঝাউল নিশান॥
উঠ্‌ গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি॥
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥
দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধুম॥
বড়ই দুখিত হৈল পলাইব কোথা।
মনদিয়া শুন সভে লোকের অবস্থা॥"

মজনুর আক্রমণ পদ্ধতিটি কেমন ছিল তারও বিস্তারিত বর্ণনা কবি দিয়েছেন :

"যেদিন সেখানে যায়্যা করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া॥
সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুয়া।
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া॥"

মজনুর আগমনে গ্রামের লোকের অবস্থা বড়ই করুণ :

"ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
পাছুয়া বেপারী পলায় গাছে ছাড়্যা গুড়॥
নারীলোক না বান্দে চুল না পরে কাপড়।
সর্ব্বস্ব ঘরে থুয়্যা পাথারে দেয় নড়॥
... ...
বড় মনুষ্যের নারী পলায় সঙ্গে লয়্যা দাসী।
জটার মধ্যে ধন লয়্যা পলায় সন্ন্যাসী॥"

মজনুর লুঠেরা দলবলের প্রতি কবির গুরুতর অভিযোগ :

"থাল লোটা লইল না পাইল উদ্দিশ।
টাকার নালচে চিরে শিওরের বালিশ॥
আল্‌দা মাটী দেখি ফকির করে পোচপোচ।
টাকার লাগি যে মারে বাস্কের খোট॥
মহাজনের সিন্দুক কাড়ি টাকা লইল ঝাড়া।
আগে লুটে বাড়ীঘর পাছে আড়াপাড়া॥"

কবির মতে, বাংলা নাশের নায়ক মজনুর ফকির নাম বৃথা। রাজা-প্রজা সকলের কাছেই সে কালান্তক যম। যেদিন যেখানে এসে মজনু অবস্থান করে, ভিতু বাঙালি লোক সেখান থেকে আগেভাগেই পালায়। যথাসর্বস্ব ঘরে ফেলেই তারা পথে দৌড় দেয়। আর লুঠেরা সন্ন্যাসীরা টাকার আশায় মাথার বালিশ চিরে ফেলে, ঘরের মেঝের যে অংশের মাটি আল্‌গা মনে হয় সেখানকার মাটি ওলটপালট করে টাকা খোঁজে। এইভাবে ঘরবাড়ি লুঠ করে বেড়াতে থাকে তারা।

এখানে মজনুকে লুঠেরা দস্যু হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই। আবার এদের মধ্যে কামাতুর ফকিরেরও অভাব ছিল না।

"ভাল মানুষের কুল বধূ জঙ্গলে পলায়।
লুটেরা ফকির যত পাছে পাছে ধায়॥
যদি আসি লাগ পায় জঙ্গলের ভিতর।

বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৈতর ॥
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতি কাকুতি করি কি বলে বচন ॥
দন্তে কুটা করি বাপু ধরি হাত পাও।
অতিথ ফকির তোমরা দুনিয়ার বাপ মাও ॥"

এই লুঠেরা দস্যুদের ভয়ে ভদ্র কুলবধূরা আত্মরক্ষার দায়ে জঙ্গলে পালায়। কিন্তু সেখানেও তাদের নিষ্কৃতি মেলে না। দস্যুর দল সেই জঙ্গল পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে সহজেই তাদের ধরে ফেলে। তখন যুবতী রমণীরা তাদের হাতে পায়ে ধরে আত্মসম্মান বাঁচাবার আশায়।

উপরোক্ত বর্ণনায় পাওয়া সন্ন্যাসী-ফকিরদের চরিত্রের সঙ্গে মারাঠা বর্গীদের চরিত্রের কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে মহৎ আদর্শ নিয়ে কোন আন্দোলন গড়ে উঠলেও, তা যখনই বৃহৎ আকার ধারণ করে তখন আর তা সবসময় সম্পূর্ণভাবে নেতাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না। তবু মজনুর উৎপীড়ন কোন সাধারণ মানুষের ওপর ছিল বলে খবর পাওয়া যায় না। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি দেশের ধনী ও জমিদার সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর জেহাদ ঘোষিত হয় বিদেশী শাসক এবং দেশের সমস্ত ধনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই। নইলে ইংরেজরা তাঁকে সকল অপকর্মের নায়করূপে চিহ্নিত করলেও, তাদের চিঠিপত্রে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যেখানে বলা হচ্ছে মজনু বা তাঁর দল দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। বরং সাধারণ মানুষের ওপর কোন-রকম অত্যাচার না করার জন্যই তিনি যে বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিতেন, এর সপক্ষেই কিছু চিঠিপত্র মেলে।[৯] আর এ কথাও সহজেই অনুমান করা যায় যে, সাধারণ মানুষের ওপর কোনরকম অত্যাচার হলে মজনু শাহ্ কখনই এমন গণ-সমর্থন লাভ করতে পারতেন না। তবু সব দেশে, সব কালে সব আন্দোলনেই আদর্শহীন সুযোগ-সন্ধানী কিছু মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। এক্ষেত্রেও

হয়তো তার অন্যথা হয়নি। এ সম্পর্কে আলোচ্য-পদ রচয়িতাও সম্ভবত সচেতন ছিলেন। তাই তিনি এই বিদ্রোহী দলের সন্ন্যাসী-ফকিরদের 'সুজন' ও 'অধম' এই সুস্পষ্ট দুটি ভাগে চিহ্নিত করেছেন। কবি খেদ করে বলছেন—

"ফকির হইয়া কর ছাগলের কাজ।
পরিণামে দুঃখ পাবা ঈশ্বর সমাঝ॥
সুজন ফকির হয়ে শুনি হস্ত দেয় কাণে।
অধম ফকির হাত বাড়ায় যৌবনে॥
পরিণাম নাহি শুনে করয়ে শিঙ্গার।
দৌড়িয়া যাইতে কাড়ি লয় বস্ত্র অলঙ্কার॥
লাজে নাহি কথা রাখে গুপ্ত ভাবে।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি তারা মজনুকে শাপে॥
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক॥
কোন্ দেশ হইতে আইল অধম।
ইহাকে ভারথে থুয়্যা পাশরিছে যম॥"

সন্ন্যাসীদের উৎপীড়ন-অত্যাচারকে ঘিরে আরও একটি ছড়ার কথা জানা যায়। এটি 'মহাস্থানগড় ছড়া' নামে পরিচিত। রচনাকাল ১২২১ বঙ্গাব্দ। রচয়িতা বগুড়া জেলার নারুলি গ্রামনিবাসী দ্বিজ গৌরীকান্ত।[১০]

বগুড়া জেলার মাইল ছয়েক উত্তরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। সেখানে করতোয়া নদীর উপকূলে শিলাদেবী ঘাটে বিশেষ তিথি উপলক্ষে পৌষ-নারায়ণী স্নানের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে বহু স্নানার্থী ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটে। আলোচ্য 'মহাস্থানগড় ছড়া'য় সেই যোগস্নান উৎসবে যোগদানকারী অত্যাচারী সন্ন্যাসীদের আগমন-বার্তায় পুণ্যার্থীদের সন্ত্রস্ত হয়ে পালাবার বর্ণনা মেলে।

"বৈশাখ মাসেত কথা উপস্থিত হৈল।
দৈবযোগে হেনকালে পৌষ মাস আইল॥

পৌষ মাসের সোমবার অমাবস্যার ভোগ।
মূলা নক্ষত্রেতে পাইল নারায়ণী যোগ॥...
মঙ্গলবারের দিন আইল ছয় শত সন্ন্যাসী॥
তারা কাশীবাসী, মহাঋষি, উর্দ্ধবাহুর ঘটা।

... ...

সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়্যা গেল শঙ্কা।

... ...

হাজারে হাজারে বেটারা লুট করিতে আইসে।

... ...

বেটাদের অস্ত্র আছে, রাখে কাছে, বন্দুক সাঙ্গি তীর।
তরার চিমীঠা, খাপে ঢালে ঢাকা শির॥"

এখানেও সেই একই কথা বলতে হয়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শত শত দরিদ্র দেশবাসীর দুঃখে কাতর বিদ্রোহী সন্ন্যাসী-সৈনিকের চিত্র এ নয়। এ হল পূর্বোক্ত দুর্বৃত্তদের—তথা অত্যাচারী অধম সন্ন্যাসীদের নিয়ে রচিত ছড়া। সেইসঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে, এই অধম সন্ন্যাসীদের সংখ্যাও তখন অল্প ছিল না। নইলে দুটি ভিন্ন অঞ্চলের, ভিন্ন সময়ের কবি সেই একই অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যেতেন না।

কয়েকটি ছড়ায় হেস্টিংসের সময়কার কিছু খবরাখবর, তাঁর অন্যায় আচরণের বিবরণ ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে মেদিনীপুর-নিবাসী কবি মদনমোহন রচিত 'রাস্তার কবিতা'[১১] নামক গাথাটির পটভূমি ঐতিহাসিক। সেখানে হেস্টিংসের সময়ে ইংরেজ কোম্পানি চণ্ডালগড় থেকে শালিখা (সালকিয়া) পর্যন্ত যে রাস্তা তৈরি করিয়েছিল, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। হেস্টিংসের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মহারাজা চৈতন্য সিংহের যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে হেস্টিংসের পরাজয়ের বিবরণ এতে পাওয়া যায়, যদিও চৈতন্য সিংহের সঙ্গে হেস্টিংসের বিরোধের কারণটি কোথাও বলা হয়নি। চৈতন্য সিংহ কোম্পানির আনুগত্য স্বীকার

না করাতেই সম্ভবত এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে হেস্টিংসের পরাজয়ের কারণ যে ভালো রাস্তার অভাব, সে কথা কবি স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন। আরসেই কারণেই হেস্টিংস কোম্পানিকে হুকুম দিলেন ভালো পথ তৈরির জন্য,যে পথে তিনি আবার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হতে পারবেন সহজে। আলোচ্য গাথাটি সেই রাস্তা তৈরির কাহিনী নিয়ে রচিত।

"শুন শুন সর্ব্বজন একমন হঞা।
রঙ্কিণী যখন আইল জাঙ্গার বাহিআ॥
চণ্ডালগড় হৈতে, চণ্ডালগড় হৈতে,
যেন মতে হিষ্টিনী হারিল।
চৈতন্য সিংহ মহারাজ জানে সর্ব্বজন,
চলিলা তার সনেতে, চলিলা তার সনেতে,
রণ করিতে হিষ্টিনী হারিল।
দেখ রঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল॥

পালাল প্রাণ লইআ, পালাল প্রাণ লইআ,
সব ছাড়িআ কলিকাতা পহুছিল।...
ফের চণ্ডালগড়ে থানা, ফের চণ্ডালগড়ে থানা
কথোজনা ধরিতে বেগারি।
পোহিল্যা মকসুদ্ করি, পোহিল্যা মকসুদ্ করি,
রসি ধরি কৈল মহাজারি॥
শঙ্কা সর্ব্বলোকে, শঙ্কা সর্ব্বলোকে,
পূর্ব্বমুখে বান্ধিআ চলিল।
যেন সীতা হেতু সাগর শ্রীরাম বান্ধিল॥

জয় ঢাকেতে বাদ্য বাজে ভাল।
সিফাই সঙ্গে কত রঙ্গে মূৰ্ত্তি লালে লাল॥...

ছামুতে যাহা পড়ে, ছামুতে যাহা পড়ে,

কাটে ছিঁড়ে গাছ পাথর আদি।
দেবতা পেলে ছুঁড়ে ফেলে পঞ্চানন আদি॥
গায়ে তার হাথ দিআ, গায়ে তার হাত দিআ,
উপাড়িয়া শিবকে পেলিল।
কত গ্রাম নিব নাম পশ্চাৎ করিল॥

হরিপাল বামে থুআ, হরিপাল বামে থুআ,
পাছু হআ ভূরশুট পরগণা।
শীঘ্র গেল কাট্‌রাজুলা ধারে দিল তার থানা॥
সেখানে বান্ধিল বড়, সেখানে বান্ধিল বড়,
কোরে দড় সাঁখারি খাটাআ,।
মাঠে মাঠে শালিখাঘাটে উতরিল গিআ॥

আড়পার কলিকাতা'ত, আড়পার কলিকাতাতে,
নৌকা পথে গঙ্গা পার হল্য।
সহর দিআ হুজুর হআ কুর্ণিশ করিল॥
শুনি সাহেব হর্ষ হল, শুনি সাহেব হর্ষ হল,
পাঠাইল বহু সেনাগণ।
শ্রীগুরু ভাবিআ কহে মদন মোহন॥...
হল্য ইতি রাস্তার কবিতা।"

এই ঘটনা নিয়ে রচিত আরও একটি পুঁথি পাওয়া গেছে।[১২] এটির রচয়িতা আবদুলপুর নিবাসী দ্বিজ রাধামোহন।

'গোরার কবিতা' নামে রাস্তা তৈরির কাহিনী নিয়ে আরও একটি গাথা রচিত হয়েছে।[১৩] এর রচয়িতা দ্বিজ দ্বারকানাথ। এই গাথা-টিরও সামাজিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মহামন্বন্তর বাংলার গ্রামগুলিকে জনবসতিহীন মহাশ্মশানে পরিণত করেছিল। সেই সময় বীরভূম, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর ইত্যাদির অনেক

ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামই ঘন জঙ্গলের শামিল হয়ে, বন্য জন্তুর চারণভূমিতে পরিণত হয়েছিল। বীরভূমের ঐতিহাসিক রাজপথ ও তার আশপাশের গ্রাম তখনও অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ। সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নতুন করে কোন বসতি গড়ে ওঠেনি। রাজপথের এই অবস্থায় ইংরেজ ফৌজেরই অসুবিধে হল সবচেয়ে বেশি। অনতিক্রমণীয় দুর্গম পথকে সুগম করবার কাজে লাগানো হল গোরা সৈন্যদের। ফলে গ্রামবাসী-দেরও ডাক পড়ল বেগার খাটবার জন্য। শুধু তো রাস্তা তৈরি নয়। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে হবে! জঙ্গল হাসিল করতে হবে। গোরা সৈন্যদের খাবার যোগাতে হবে। এক কথায়, গোরা ফৌজের যাত্রাপথ সুগম করতে যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ও উপকরণ গ্রামবাসীদেরই যোগাতে হবে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কবি লিখলেন—

"শুন সবে এক ভাবে বিপত্তের কাজ।
জেন মতে লড়াই দিতে সাজিল ইংরাজ॥
থাকে সব বরমপুরে, ফৌজ জুড়ে, কি দিব তুলনা।
এক এক গোরার পিছু সিপাই তিন জনা॥"

বহরমপুর ফোর্টে যে-সব ইংরেজ থাকত তাদের এক এক জনের সঙ্গে তিনজন করে সিপাই দিয়ে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত করা হল। এই গোরা সৈন্যদের ওপর হঠাৎ একদিন যুদ্ধযাত্রার হুকুম হল। এ খবর পেয়ে জমিদার সহ গ্রামের লোকের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হল। বাদশাহী গোরা সৈন্যের যাত্রাপথের দু'ধারের গ্রামের রায়তদেরও সে-সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হল।

"জাবে সব পশ্চিমেতে, আচম্বিতে, আইল পরওয়ানা
জমীদার লোক শুনে, করিছে ভাবনা।...
আচম্বিতে শুনে লোকের লাগিল তরাস।
সাহেব ডেকে বলে, রেয়ৎ লোকে, সাবধান হও তোমরা
এই রাস্তা দিয়া জাবে বাদসাই গোরা।"

গোরা ফৌজের অত্যাচার-উৎপীড়নের পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে

গ্রামবাসীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল। তখন ভীতসন্ত্রস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে গরু এবং জরু নিয়ে দেশান্তরী হবার ধুম পড়ে গেল। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, যাদের অত সহজে পালানো সম্ভব নয় তারা ঘরে দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করল।

"বলে ভাই, পড়লো দায়, রৈতে নারি ঘরে
গরু জরু সকল লয়ে পলায় দেশান্তরে।
পলায় সব কলুমালি, তিলি তামলি, মনে পেয়ে ভয়
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কপাট দিয়ে রয়।"

যারা পালাতে পারল তারা বেঁচে গেল। কিন্তু যারা কোনক্রমেই পালাতে পারল না, তাদের ঘরে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে রেহাই পাবার উপায় রইল না। কারণ স্বয়ং জমিদার পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীদের শ্রম এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে কড়া হুকুম জারি করলেন।

"জমীদার গ্রামে গ্রামে, পেয়দা লয়ে, আনে মণ্ডল ধরি
তোমরা খাবার খোরদানা দাও, বেট আর বেগারি।
বলদের খোরদানা চাই আনা আউড় পোয়াল লাড়া।
জিনিষ দিতে কোন কাজের ওজর না করিহ তোমরা।"

সুতরাং গোরা সৈন্যদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে গ্রামবাসী নাজেহাল। কোনরকম ওজর-আপত্তি করবার উপায় নেই। কারণ সেখানে রক্তচক্ষু শাসন সদা-জাগ্রত।

"ইজাদার কৈছে তারে, মাছের তরে, ঘন লাড়ি মাথা
কেয়ট বলে, এত জাড়ে মাছ পাব কোথা।
শুনে উঠ্‌লো রেগে, মাছের লেগে, রাখ বেটাকে ধরে
দেখে দাপ্, বলে বাপ্, জালে লাগলো গিরে।"

গোরা সৈন্যদের ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুর আচরণ শুরু হয়েছে যাত্রাপথের প্রথম অঞ্চল বহরমপুর থেকেই। এইভাবেই তারা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে বীরভূমের দিকে। তারপর সিউড়িতে এসে যখন তারা তাঁবু

ফেলল, তখন সেখানকার গ্রামবাসীদের অবস্থা বর্ণনাতীত। গোরা ফৌজের বেগার খাটতে খাটতেই গ্রামবাসীর প্রাণান্তকর অবস্থা।

"বিষম ফোজের লেঠা—
দুয়ারে দুয়ারে দিল সিয়া কুলের কাটা।...
তখন ফৌজ সিউড়ি গ্রামে, সর্ব্বজনে পড়িল ঘোষণা
নফর চাকর বেট্ বেগারী পড়লো তাম্বুখানা।"

'রাস্তার কবিতা'য় যেমন প্রধানত জঙ্গল পরিষ্কার করে রাস্তা তৈরির প্রসঙ্গটিই বর্ণিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে এই রাস্তা তৈরির কারণও বর্ণনা করা হয়েছে, 'গোরার কবিতা'য় প্রধানত সেই রাস্তা তৈরির প্রসঙ্গে গ্রামবাসীদের ওপর যে জুলুম, যে উৎপাত-উৎপীড়ন হয়েছিল তারই কথা বলা হয়েছে।

১১৯০ বঙ্গাব্দে রংপুরের কালেক্টর হলেন গুডল্যাড সাহেব। জেলাবাসীর প্রতি তাঁর অন্যায় অত্যাচারে স্থানীয় জনসাধারণের বিক্ষোভ, রাজনৈতিক কারণেই ঐতিহাসিক। রংপুরের রাজার সম্পূর্ণ অমতেই গুডল্যাড সাহেব দেওয়ানি পদ দিতে চাইলেন তাঁর প্রিয়পাত্র রামবল্লভকে। সাহেবকে রুষ্ট করবার ভয়ে রাজা বাধ্য হয়েই তা মেনে নিলেন।

এদিকে সুচতুর রামবল্লভ দেওয়ান হয়েই রাজার মহল বে-আইনি ভাবে কিনে নেবার চক্রান্তে লিপ্ত হলেন। যথাসময়ে রাজা এই খবরটি জানতে পারলেন। তিনি আর কিছু করলেন না, কেবল খবরটি দ্রুত প্রজাদের কানে তুলে দিলেন। এই খবর শুনে উন্মত্ত প্রজার দল গুডল্যাড সাহেবের কাছে দেওয়ানের পদত্যাগ দাবি করে এবং জয়ী হয়। এই আন্দোলনের বিষয়টি মহীপুর নিবাসী কৃষ্ণ হরিদাস নামে জনৈক অখ্যাত গ্রাম্যকবির গাথায়[১৪] ধরা পড়ে। উন্মত্ত প্রজাদের চাপে পড়ে সাহেব রামবল্লভের কাছেই পরামর্শ চান।

"শুন শুন রাম বল্লভ রায়।
রায়তে না ছাড়ে পিছ কি করি উপায়॥"

এদিকে ততদিনে উন্মত্ত রায়তদের ক্ষমতা লক্ষ্য করে রামবল্লভেরও দেওয়ানিলাভের মোহভঙ্গ হয়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন এই রায়তরা খুশিমতো কাউকে মাথায় তুলতে পারে, আবার কাউকে আছাড় মারতেও পারে। তাই হতাশ হয়ে তিনিও বলেন :

"দেওয়ান বলে রায়ত সব করতে পারে।
কাকেও স্বর্গে তোলে কাকে আছাড় মারে॥
রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালী।
যত দেখ সোনার বালা রায়েতের কড়ি॥"

সুতরাং অনন্যোপায় সাহেবও অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে দেওয়ানের পদত্যাগ ঘটিয়ে রায়তদেরই খুশি করতে চান :

"সাহেব বলে আজ হতে দেওয়ান খারিজ হইল।
শুনিয়া সকল প্রজা স্বর্গ হাতে পাইল॥"

এই সিদ্ধান্তে রায়ত প্রজাদের সরল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ শোনা যায় :

"মহাশব্দ করি সবে ঝাকি দিয়া কয়।
জীয়া থাক সাহেব তোমার বিবির হউক জয়॥"

হেস্টিংসের নিত্য সহচর ছিলেন দেবী সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, বেনিয়ান কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ ও কাশীনাথ। এঁদেরই সহযোগিতায় হেস্টিংস বাংলায় শোষণ-পীড়ন চালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে কান্তবাবু হলেন কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। হেস্টিংসের কান্তবাবুকে বিশেষ পছন্দ করার পিছনে একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠিতে মুহুরীর কাজ করতেন এই কান্তবাবু। নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লা যখন কাশিমবাজার দখল করলেন, তখন ওয়াটসন সাহেব ছিলেন এর অধ্যক্ষ, আর হেস্টিংস ছিলেন সামান্য এক কর্মচারী। সিরাজের আক্রমণে ইংরেজ পক্ষ-পরাজিত হয় এবং অন্যান্য অনেকের সঙ্গে হেস্টিংসও বন্দী হন। বন্দীদের মুর্শিদাবাদে আনা হল। কথিত আছে, হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে কাশিমবাজারে কান্তবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবার

এমনও বলা হয় যে, হেস্টিংসের মুক্তিলাভের সঙ্গে কান্তবাবুর একটি বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, সেই থেকেই কান্তবাবুর ভাগ্যোদয়ের সূচনা হয়।[১৫]

এই কাহিনীর বিস্তার নিয়ে পরবর্তীকালে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর রচিত একটি রস-রচনা পাওয়া যায়। সেই ছড়াটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"হেষ্টিংস সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত।
কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত॥
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়।
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়॥
কান্তমুদী ছিল তার পূর্বে পরিচিত।
তাহারি দোকানে গিয়া হল উপনীত॥
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে।
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে॥
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান॥
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়।
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পান্তা ভাত আর চিংড়ি মাছ।
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলা গাছ।...
সূর্য্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে।
হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে॥"[১৬]

ঘটনা যা-ই হোক না কেন, কান্তবাবুর প্রতি হেস্টিংসের সৌহার্দ্যের কারণের পিছনে গূঢ় তত্ত্ব আছে সন্দেহ নেই।

হেস্টিংস বাংলার জমিদারদের খাজনার হার অতিরিক্ত পরিমাণে ধার্য করেছিলেন। সেই কারণে যে-সকল জমিদার সেই উচ্চহারে খাজনা দিতে পারেননি, তাঁরা হেস্টিংসের নির্দেশমতো কলকাতায় বন্দী ও অপমানিত হতেন এবং শেষপর্যন্ত তাঁদের সবচেয়ে ভালো ভালো সম্পত্তি

তাঁর প্রিয়পাত্র গঙ্গা মণ্ডল, নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু ও গঙ্গাগোবিন্দের মধ্যে নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতেন। ফলে সম্পত্তি হারিয়ে জমিদাররা স্বভাবতই ইংরেজদের পক্ষপাতী হননি। বীরভূম প্রভৃতি স্থানের রাজা-জমিদাররা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং পরিশেষে কেউ কেউ ডাকাত আখ্যাও লাভ করেছিলেন। এই পথেই হেস্টিংস বীরভূমের রাজা বাদি-উজ-জামান খাঁর সম্পত্তি নিলামে তুলে নামমাত্র মূল্যে তাঁর প্রিয়পাত্রদের মধ্যে বিলি করেন এবং খাজনার দায়ে রাজাকে প্রথমে বন্দী ও পরে ভিখারীর পর্যায়ে নামিয়ে আনেন। রানী ভবানীর এলাকাভুক্ত বাহারবন্দ ছিনিয়ে নিয়ে হেস্টিংস কান্তবাবুর নাবালক পুত্র লোকনাথের নামে প্রথমে ইজারা এবং পরে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিলেন মাত্র ৬৩৯ টাকায়। বারাণসীরাজ চৈৎ সিংহের বালিয়া পরগনাও দিয়েছিলেন কান্তবাবুকেই। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে একটি ছড়া রচিত হয়েছিল।[২৭] কবির নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।

"মহারাজ চৈৎ সিং কাশীধামে ছিল,
হেষ্টিংসের সনে তার বিবাদ ঘটিল॥
মাঝ থেকে কান্তবাবু লুটে মজা নিল।
মহামূল্য ধনরত্ন ঘরে নিয়ে এল॥
রাজার ঠাকুর আর সুন্দর দালান।
নিয়ে এসে বসায়েছে করিয়া আপন॥
পুকুর চুরির কথা জমিদার জানে।
দালান চুরির কথা হেষ্টিংস সে জানে॥"

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশে দেশের সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ নিয়েও হেস্টিংসের কলঙ্কের অন্ত ছিল না। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে ঘিরে অনেকগুলি ছড়া রচিত হয়েছিল।

"আজগুবী এক আইন হয়েছে,
কৌলচলিদের সাথে হেষ্টিন ঝগড়া বাঁধিয়েছে।

আ. শ. বাং পুং. ই. প্র.-১০

হায়রে হায় একি হোল বামুনের ফাঁসি হোল,
নন্দকুমার মারা গেল, গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।"[১৮]

এ সম্পর্কে আর একটি ছড়ায় সেই ঐতিহাসিক ঘটনার দিন-ক্ষণসহ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় :

"বাঙলা এগারশত বিরাশির সালে,
২১শে শ্রাবণ শনিবারের সকালে।
ব্রহ্মনাশ হয়ে গেল আলিপুরের মাঠে,
হেষ্টিংসের হৃৎকম্প হতো যার দাপটে।
লোকারণ্য মাঠ ঘাট লাগিল কাঁদিতে,
ফাঁসি হবে শুনে লোক লাগিল ছুটিতে।
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি যেই নিল শিরে,
এই পরিণাম তার লোক চিন্তা করে।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল ইহার,
কে জানে হেষ্টিংস ইম্পের কেমন বিচার।"[১৯]

অপর একটি ভাবপ্রবণ গ্রাম্য ছড়ার উল্লেখ করে প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করা যাক :

"মহারাজ নন্দকুমার রে,
তোর রাজ্যপাট কারে দিলিরে ?
নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেষ্টিং সাহেব এলো জান করিবারে বারি ॥
নন্দকুমার মা কাঁদে, ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা যোড়া ডিঙ্গি বেয়ে।
খোপেতে কৈতর কাঁদে ফোঁহারাতে হাঁস।
যোড় বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুলতি বাঁশ ॥
ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণীগো দিদি।
সিঁতে ছিল কড়া সিন্দুর বঞ্চিত করলেন বিধি ॥"[২০]

বাংলায় আঠারো শতকের মতো দেশের সর্বাঙ্গীণ সঙ্কটময় শতাব্দী

বোধহয় আর আসেনি। সেই আঠারো শতকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার দিনে গ্রাম্যকবি অথবা কবিযশপ্রার্থী এইসব ব্যক্তি গাথা বা ছড়া রচনা করে গেছেন সমকালীন ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়। এইসকল রচনার কালজয়ী কোন সাহিত্যিক মূল্য অবশ্যই নেই। কিন্তু সামাজিক বিষয়-প্রধান ও তথ্যমূলক এবং অনেক সময়েই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হওয়ায় এদের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এইশ্রেণীর রচনা সংখ্যায় প্রচুর। এখানে তাদের মধ্য থেকে কয়েকটিমাত্র তুলে ধরা হল। এদের একত্রিত করলে শতাব্দীর সামাজিক, রাজনৈতিক ছবিটি ফুটে উঠতে পারে সহজেই, যে-ছবি কোন ঐতিহাসিক দলিলে ধরা পড়তে পারে না। এখানেই এদের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১. বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত, পুঁথি সংখ্যা ১৮৭২। এরপরে পুঁথিটি খণ্ডিত।

২. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র', ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, জানুয়ারি ১৮৯৯, পৃ. ৯৭।

৩. 'পুঁথি পরিচয়', ১ম খণ্ড, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পুঁথি সংখ্যা ১২৯।

৪. 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা', সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৮৬।

৫. ঐ, পৃ. ১৭৪ এবং 'বাংলা গাথা কাব্য', ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৪।

৬. 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়', দীনেশচন্দ্র সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪১৩।

৭. 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা', সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭৮।

৮. 'সেরপুরের ইতিহাস', রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, পঞ্চম ভাগ, বিশেষ সংখ্যা পৃ. ৭১—৮০।

৯. **Letter from the Supervisor of Natore to the Revenue Council, dated 25th January, 1772.**

১০. ছড়াটি হরগোপাল দাসকুণ্ডু সংগ্রহ করেন এবং ১৩১৪ বঙ্গাব্দে রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র'—১ম বর্ষ, ২য়, খণ্ড, এপ্রিল ১৮৯৯, পৃ. ৩০১—৩০৪। উক্ত পত্রিকায় পুঁথিটিকে একশো বছরের পুরানো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই হিসেবে এটি আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকে রচিত বলে ধরা যায়।

১২. Dr. Sukumar Sen, History of Bengali Literature, p. 158.

১৩. কবিতাটি 'বীরভূমি' মাসিক পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শিবরতন মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৪. 'বাংলা গাথা কাব্য', ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪২—১৪৩।

১৫. 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', নিখিলনাথ রায়, পৃ. ৪২২।

১৬. 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা', সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৮৮।

১৭. 'কলিকাতার কথা', প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ. ১৪।

১৮. 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা', সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৮৬।

১৯. 'কলিকাতার কথা', প্রমথনাথ মল্লিক, মধ্যকাণ্ড, পৃ ১১।

২০. ঐ, পৃ. ৪০৯।

—

অপ্রচলিত বা স্বল্পপ্রচলিত শব্দার্থ

[পাঠকের সুবিধার্থে আলোচনার মধ্যে ব্যবহৃত ফারসি শব্দের অর্থ এবং পুঁথিতে উল্লিখিত অপরিচিত বা বিকৃত শব্দের অর্থসহ তালিকা দেওয়া হল।]

আইস্তে—আসিতে।

আউর/আউড়ি—ধান পেটানোর পর আগা বাঁকিয়ে নুড়োর মতো করা খড়ের গুচ্ছ।

আগাড়ীর—অগ্রবর্তীর।

আচাদ—মুক্ত।

আজিজ/আজীর—অতি অল্প অর্থের জন্য আত্মবিক্রয়কারী, অতিদীন।

আবওয়াব—আইনত অসিদ্ধ অতিরিক্ত কর, রাজস্ব ছাড়া অন্যান্যভাবে গৃহীত কর।

আমলা—উচ্চ কর্মচারীর অধীনস্থ কেরানী শ্রেণীর কর্মচারী।

আলদা—আলগা, শিথিল।

আড়কাট/আর্কট (Arcot)—রৌপ্যমুদ্রা-বিশেষ। আলমগীরের রাজত্বের বিংশবর্ষে আর্কট দেশে (মাদ্রাজ) মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রা।

ইংগ্রণ্ডীয়েবদের—ইংরেজদের।

ইজারা/ইজারাদার—হস্তবুদ খাজনা শোধ দেবার অঙ্গীকারে জমিদারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দোবস্ত করে নেওয়া গ্রাম বা মৌজা।

উমনি—অমনি, তৎক্ষণাৎ।

ঋণায় উপহতি/ঋণায় উপহিত—ঋণের জন্য প্রদত্ত।

একরার—প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার।

এগত্তর—একত্রিত, সমাবেশ।

এলা—এমন।

ওজর—আপত্তি।

ওমর/উমর—বয়স।

ওলদে—অমুকের পুত্র বা কন্যা অর্থে।

কলার আইঠা—কলার মূল।

কাছারি—কর্মস্থান, দপ্তর।

কানানি/কার্ণানি—কর্ণে কর্ণে সংলগ্ন, অবিরল, গায়ে গায়ে লাগা, জনসমুদ্র।

কানুনগো—ভূমি ও রাজস্ব পরিমাণ বিষয়ক হিসাবরক্ষক কর্মচারী।

কাপাস/কার্পাস—তুলা।

কাপ্তান/কাপ্‌তান—প্রধান নাবিক। ইংরাজি Captain শব্দের বিকৃত রূপ। এখানে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত।

কুঠি—যেখানে মহাজনদের টাকার লেনদেন হয়, বড় কারবারের স্থান।

কুর্তি/কুর্তা—পোশাক-বিশেষ।

কুড়খেক—পাশকুড, আঁস্তাকুড ইত্যাদি থেকে যে খায় (?) গালিবিশেষ।

কেওট—জেলে।

কৈতর/কবুতর—পারাবত, পায়রা।

কোটোয়াল/কোটওয়াল—নগররক্ষকদের প্রধান।

খটাখট্টি—অস্ত্রের পরস্পর আঘাতজনিত কঠোর ধ্বনি।

খুদকস্ত/খুদকস্তা—বসত গ্রামের জমি চাষকারী স্থায়ী স্বত্ববান রায়ত প্রজা।

খুরচি—ঘোড়ার ঘাসদানা খাবার ছোট থলিবিশেষ, তোবড়া।

খোট/খুট—কোণ, প্রান্তভাগ

খোরদানা/খোরদানী—রসদ, খাদ্যদ্রব্য।

গিরস্ত—গৃহস্থের বিকৃত রূপ।

গোমস্তা—যে কর্মচারী জমিদারি বা তালুক প্রভৃতির খাজনা আদায় করে।

ঘাটায়—ঘাটে।

ঙিঙ্গিরাজ—ইংরাজের বিকৃত রূপ।

চৈতালী—চৈত্রের ফসল।

চোপলা/চোপালা—কপাটহীন একধরনের দোলা।

চৌআরি/চৌপাড়ি—চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত পাঠশালা, টোল।

চৌকিদার—নগররক্ষার জন্য নিযুক্ত সিপাই।

চৌথ/চৌথাই—খাজনা।

চৌধুরী—রাজস্বসংগ্রহে নিযুক্ত কর্মচারী, প্রধানত মধ্যস্তরের জমিদার শ্রেণীভুক্ত।

ছমুতে—সম্মুখে।

জওগে/জওজে—স্বামী (দলিল-পত্রে)।

জবর—বলপ্রয়োগ, অত্যাচারপূর্বক, অন্যায়পূর্বক।

জমা—হাট-ঘাট ইত্যাদির বার্ষিক কর।

জমাবন্দী—প্রজার নামওয়ারী রাজস্বের হিসাব।

জরু—স্ত্রী।

জাউলা—জেলে।

জাঙ্গার/জাঙ্গাল—সেতু, বাঁধ।

জাড়ে—শীতে।

জাবাদা/জাবেদা—প্রমাণযোগ্য, আদালতের মোহরযুক্ত।

জায়গীর—রাজকর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে দেয় রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ।

জুম/জুলুম—অবিচার, অরাজকতা, অন্যায় বলপ্রয়োগ।

জোত—রায়তের চাষের অধীনস্থ জমি।

ডিহি—কয়েকটি গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি।

ডেহড়—অবিশ্রান্ত গতি।

ঢিং—অশিষ্ট, শঠ, চতুর।

তরিতে—ত্বরিৎ গতিতে।

তহশিলদার/তহসীলদার—যে খাজনা আদায় করে, গোমস্তা।

তাইদ—সাহায্যকারী কর্মচারী, নায়েব।

তাকাভি/তাকাবি—চাষের কাজের সুবিধার জন্য কৃষক প্রজাকে প্রদত্ত ঋণ।

তাজি/তাজী—তুর্কী ঘোড়া।

তাথে/তথাতে—সেখানে।

তালাইয়া/তানাইয়া—কাপড় বোনার সময় কাপড়ের লম্বা সুতো যেমন তানা দেওয়া হয়, তেমনিভাবে টাঙানো।

তালুকদার—বিশেষ-জাতীয় ভূম্যধিকারী। সরকার বা জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে নেওয়া ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মালিক। তালুক শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'অধীন'।

তুড়ুক—তুর্কী সৈন্য। এখানে তুর্কী সৈন্য দ্বারা জয় করা অর্থে ব্যবহৃত।

তেলেঙ্গ সাজ—তৈলঙ্গ দেশীয় (কর্ণাটকী) সাজ। এখানে খুব সম্ভবত লর্ড ক্লাইভের তেলেঙ্গা সৈন্যের মতো সাজ বোঝাচ্ছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ৫৩৫ সংখ্যক ধর্মমঙ্গলের পুঁথির পুষ্পিকায় রয়েছে, 'বিষ্ণুপুরকে তেলেঙ্গা আইল্য'। এই উক্তির দ্বারা সেখানেও বিষ্ণুপুরে লর্ড ক্লাইভের তেলেঙ্গা সৈন্যের উপস্থিতি বোঝাচ্ছে। মজনু সম্ভবত ওই বিশেষ সাজে সজ্জিত থাকতেন।

থানা—অবস্থান।

দড়—শক্ত।

দসরা/দশহরা—বিজয়াদশমী।

দস্তবদস্ত—হাতে হাতে।

দানিস—পণ্ডিত, জ্ঞানী। এখানে উচ্চতর কর্মচারী অর্থে।

দাপ্—দর্প।

দেওয়া/দেআ—মেঘ।

দেওয়ানি—ভূমির স্বত্ব।

দেহড়া—সম্মিলন।

নড়—দৌড়।

নাজাই—ব্যাপক হারে মৃত্যু বা দেশত্যাগজনিত কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে রাজস্বের যে অনিবার্য ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্যে স্থায়ী চাষীদের ওপর চাপানো সরকারের অতিরিক্ত করের নাম নাজাই।

নাএব-নাজিম্—নায়েব শব্দের সাধারণ অর্থ জমিদারের বা রাজার প্রতিনিধি আর নাজিম শব্দের অর্থ পাতশাহের নিয়োজিত দেশের শাসনকর্তা। মোগল আমলে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় দ্বৈত কর্তৃত্ব ছিল। নাজিম বা সুবাদার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করতেন। দেওয়ান রাজস্ব ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন। মীর-জাফরের মৃত্যুর পর পুত্র নজমউদ্দৌলা নবাব হলে কোম্পানির সঙ্গে এক সন্ধি হয় (ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫)। সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির মনোনীত মহম্মদ রেজা খাঁ নাএব-সুবা বা ডেপুটি সুবাদার হিসেবে কাজ করছিলেন। দেওয়ানিলাভের (অগস্ট ১৭৬৫) পরে ক্লাইভ রেজা খাঁকেই বাংলায় কোম্পানির দেওয়ানি কাজ চালানোর

জন্য নায়েব-দেওয়ানের দায়িত্ব দিলেন। ফলে তিনি নিজামত ও দেওয়ানি—এই দুই বিভাগেরই দায়িত্ব পেলেন। নিজামতের সঙ্গে দেওয়ানির সংযুক্তিতে এক নতুন ধরনের দ্বৈত ব্যবস্থার উদ্ভব হল—নিজামত পরিচালিত হল নবাবের নামে, দেওয়ানি পরিচালিত হল কোম্পানির নামে। একই ব্যক্তি (রেজা খাঁ) এই দায়িত্ব বহন করত বলে সেই পদটির নাম হল 'নায়েব-নাজিম'।

পখইরে—পুকুরে।

পত্তনি/পত্তনী—জমিদার যখন জমিদারির যে-কোন অংশ নির্ধারিত খাজনায় অন্যের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করার শর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তার নাম পত্তনী বা পত্তনী তালুক। বর্ধমানের রাজার জমিদারীতে প্রথমে পত্তনী তালুকের সৃষ্টি হয়।

পাইক- পদাতিক সৈন্য।

পাইকস্ত/পাইকস্তা—যে রায়ত প্রজা এক জমিদারের অধীন থেকে অন্য জমিদারের অধীনে জমি চাষ করে।

পাইছায়—পিছিয়ে, পিছনে।

পাট্টা—জমিদারের সম্মানার্থে দেয় অর্থ, সেলামী।

পাট্টাদার/পাট্টাদারি—সমগোত্রীয় শরিকী স্বত্ব।

পাথার—প্রান্তর, মাঠ।

পিছারি/পিছাড়ি—পশ্চাদ্‌ভাগ।

পুষ্পিকা—আভিধানিক অর্থে : গ্রন্থের অধ্যায় শেষে সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ক গ্রন্থাংশ। পুষ্পিকা শব্দটি পুষ্প থেকে উৎপন্ন। শব্দটি আক্ষরিক অর্থে একমাত্র পুথির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পুঁথিতে যে অধ্যায়-সমাপ্তি বাক্য পুষ্প দিয়ে চিহ্নিত, তার নাম পুষ্পিকা। পুঁথিতে অধ্যায়-সমাপ্তি বাক্যের আগে এবং পরে, কখনও শুধু পরে এক বা একাধিক পুষ্প এঁকে বাক্যটিকে অন্য বাক্য থেকে পৃথক করা হ'ত। পুষ্প-লাঞ্ছিত বলে অধ্যায়-সমাপ্তির এই বাক্যের বা বাক্যসমষ্টির নাম পুষ্পিকা।

পেটারি/পেঁটরা—বেত বা ধাতুর পেটকাকৃতি ঢাকনা-দেওয়া বাক্স-বিশেষ।

পৈরনে—পরিধানে।

পোচ/পোঁচ—ঘষে ঘষে কাটা, ফালা ফালা করা।

পোয়াল/পোয়ালা—ধানগাছের অগ্রভাগ কেটে গরু দিয়ে ধান মাড়ার পর যে খড় বের হয়।

পোসস্ত—পোস্ত শব্দের বিকৃত রূপ।

পোহিল্যা/পহিলা—প্রথম।

ফজত্থর/ফৌজদার—ফৌজের অধ্যক্ষ, বাদশাহের স্থানীয় গভর্নর।

ফসলী/ফসলী খাজনা—কর হিসেবে দেয় ফসলের অংশ।

ফরাস/ফরাসী—ফ্রান্সের অধিবাসী।

ফরাসবন্দি—পুলবন্দি।

ফোদ—ফোর্ট শব্দের বিকৃত রূপ।

বন্দোবস্ত—জমির বিলিব্যবস্থা, settlement.

বরকন্দাজ—প্রভুর দেহরক্ষী, বন্দুকধারী সৈন্য।

বহনিয়া—বাহক।

বাখান—ব্যাখ্যা, বিবৃতি, বৃত্তান্ত ইত্যাদি। এখানে নিন্দাসূচক বা গালি অর্থে ব্যবহৃত।

বার্গীর—মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে দুই শ্রেণীর সৈন্য থাকত, বার্গীর ও শিলাদার। যারা মারাঠা সরকার থেকে ঘোড়া ও অস্ত্র পেত, তারা বার্গীর নামে পরিচিত। আর শিলাদার নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর মারাঠা সৈন্য ছিল, এরা নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। এই পার্থক্য না জানা থাকার জন্য বাঙালিদের কাছে সব মারাঠা সৈন্যই বর্গী নামে পরিচিত ছিল।

বারনা/বারণা—নিবারক, রোধক, প্রতিবন্ধক।

বাহুকে—বাঁকে, ভারে, হাতে।

বিছন—বীজধান।

বিপত্য/বিপত্ত—বিপদ। এখানে বিমথ অর্থে।

বুধ্য—বুদ্ধি শব্দের বিকৃত রূপ।

বেট/ভেট—উপহার, নজরানা।

বেলঙেক/বিলগ্ন—পৃথক, অপরিচিত।

বোগদা—বলদ।

ভাই/ভাও—মূল্য, দর।

ভাতার—সংস্কৃত ভর্তৃ শব্দ থেকে উৎপন্ন। পতি, স্বামী।

ভাদাই/ভাদই—ভাদ্রমাস সম্বন্ধীয়, ভাদ্রের ফসল, আউস ধান।

ভুঞ্জে—ভোজন করে, ভোগ করে।

মনসব—মুঘল আমলাদের মর্যাদার ও পদের সূচকচিহ্ন।

মনসুবা—পূর্ব পরিকল্পনা, পরামর্শ।

মসনদ—সিংহাসন, গদী।

মহরি/মুহরি—লিপিকর, মুনশী।

মহাল—রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা।

মহাদুব্বিকো—মহাদুর্ভিক্ষে শব্দের বিকৃত রূপ।

মাউছা/মেছো—মৎস্য-ব্যবসায়ী।

মাল—ভূমির রাজস্ব, খাজনা।

মালগুজারি—সরকারের প্রাপ্য মাল-জমির খাজনা।

মুজা—মোজা শব্দের বিকৃত রূপ।

মুজারিন/মুজারিয়ান্—ভাগচাষী, শ্রমদানের বিনিময়ে যে চাষী উৎপন্ন শস্যের অংশ পায়।

মুদ্দত মৈদ্ধে/মুদ্দতের মধ্যে- নির্দিষ্ট কালের মধ্যে।

মোকে—আমাকে।

মৌজা—কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি।

রঙ্গস্যাম/রঙ্গশ্যাম—শ্যামবর্ণ।

রাইয়ৎ/রায়ত—চাষ করার জন্য যে জমি ভোগ করার স্বত্ব পায়, কৃষক প্রজা।

লওয়াজিমা/নওয়াজিমা—অতিপ্রয়োজনীয় লোক।

লঘ্যি—প্রাকৃতিক কাজ, লঘু কাজ। সভাস্থলে এইরূপ সংকেত শব্দ ব্যবহার করার রীতি ছিল।

লাড়া নাড়া—ধানগাছের অগ্রভাগ কেটে নেবার পর যে অংশ পড়ে থাকে, তাকে নাড়া বলে।

লালচে/লালচ—লালসা, লোভ।

লালবন্দি—রাজ্যের রাজস্ব নির্ধারণ পূর্বক দেয় কর।

লাহাঙ্গা তলোয়ার—ইস্পাতের তরবারি (?), খোলা তলোয়ার (?)

শিঙ্গার—শৃঙ্গার।

সকাব্দ/শকাব্দ—শকরাজ শালিবাহন কর্তৃক প্রচলিত বর্ষগণনা।

সদর—রাজার বা জমিদারের কার্য পরিচালনার প্রধান স্থান। সদর কাছারিতে দেয় কর, সদর খাজনা।

সনদ—রাজশাসন পত্র, ভূমিদান পত্র, হুকুমনামা।

সব্বাহ—যোগান। সরবরাহ শব্দের বিকৃত রূপ।

সিক্কা/শিক্কা—রাজকীয় ছাপযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা।

সিয়াকুল/শিয়াকুল—বন্য কাঁটাজাতীয় লতা-বিশেষ।

সিজাইয়া—সিদ্ধ করিয়া।

সুথা—খরা।

সুভিক্ষ—ভিক্ষা সমৃদ্ধিকাল।

সোয়ারিত/সোআর—সওয়ার, আরোহী।

হডপি—তাম্বূলপাত্র

হাসিল/হাঁসিল—আবাদী, শস্যোৎপাদক। এখানে জঙ্গলকে চাষের যোগ্য করে তোলা অর্থে।

হিষ্টিনি—হেষ্টিংস শব্দের বিকৃত রূপ।

নির্দেশিকা